# জ্ঞানচক্ষু

**জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের**
**বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।**

**অভিনব দর্শন**

**রাম নারায়ণ রাম**
**সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-**
শ্রী চপল মিত্র

**সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-**
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

**সহযোগিতা ঃ-**
অনির্বাণ, দেবতনু

**প্রথম প্রকাশ ঃ-**
শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৮

**মুদ্রণ ঃ-**
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

**চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-**
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in
infoavinabadarshan@gmail.com
Website : www.avinabadarshan.com (Free Site)
(Bangla, Hindi, English)

**প্রাপ্তিস্থান ঃ-**
১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

# মুখবন্ধ

স্রষ্টার অনন্ত শক্তিতে জীবজগতের প্রত্যেকেই শক্তিমান। জীবজগতে কেউ কারও চেয়ে শ্রেষ্ঠও নয়, আবার নিকৃষ্টও নয়। বড়ও নয়, আবার ছোটও নয়। সুতরাং স্রষ্টার যে সৃষ্টির ক্ষমতা, যা আমাদের মধ্যে রয়েছে, সেই সহজাত বিষয়বস্তুকে সহজে পালন করলে আমরা সবকিছু পেতে পারি। প্রকৃতির নিয়মের বশে বশীভূত হয়ে আমরা যদি নীরবে কর্ম করে যাই, সেইভাবে কর্মের দ্বারা আমরা যদি অগ্রসর হই, তাহলে অনিবার্যভাবে জেগে উঠবে আমাদের ভিতরের সুর, উন্মুক্ত হয়ে যাবে জ্ঞানচক্ষুর দ্বার।

অন্ধকারে ঘেরা আমাদের জীবন। প্রতি মুহূর্তে অন্ধকারের জালে আমরা আবদ্ধ হয়ে আছি। আমাদের চারিদিকে কুয়াশা। গার্হস্থ্য জীবনে, সমাজ জীবনে, এমনকি মনোজগতেও আমরা কুয়াশার ঘেরাটোপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। আর এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই মহাশক্তির (আগ্নেয়গিরির ন্যায়) অনন্ত খনি আছে। একটা জ্বলন্ত দেশলাই কাঠি এই পৃথিবী ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ ত্রিনয়নে (জ্ঞানচক্ষুতে) মন নিবিষ্ট করলে, তার যে মাত্রা, সেই মাত্রার যে তাপ, সেই তাপে 'তা' দিলে অনন্ত মহাশূন্যের শক্তি করায়ত্ত হবে। জ্ঞানচক্ষু ফুটে উঠবে। সাথে সাথে দেহবীণাযন্ত্রের লক্ষ কোটি গ্ল্যান্ডকে একসাথে ফুটানো সম্ভব হবে। সেই মাত্রার যে তাপ, সে 'তা'টি জানাই হচ্ছে একমাত্র সাধনা।

আমরা শুধু এখানকার চাওয়া পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করি। আর চাওয়া পাওয়ার চাহিদাটা যখন লোভে পরিণত হয়, তখন সেই চাহিদা মিটানোর জন্য একে অন্যের গলায় ছুরি মারতেও দ্বিধাবোধ করি না। অথচ একটু মনন করলেই, অনন্ত বিশ্বের কেন্দ্রস্থল এই আজ্ঞাচক্র বা জ্ঞানচক্ষু ফুটলেই চাওয়া পাওয়ার কোনকিছু বাকী থাকে না। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছি, সেই পথ দিয়েই আমাদের যেতে হবে। একথা জানলেও আমরা অন্তর থেকে ভালভাবে মানতে বা গ্রহণ করতে পারিনি। তাই মৃত্যু যে হবে একদিন, সেটা তত মনে লাগে না। যদি লাগতো; তাহলে এত হানাহানি, মারামারি থাকতো না।

অনন্ত কোটি অণুপরমাণুর দ্বারা আমাদের এই দেহযন্ত্র গঠিত। এই অণুপরমাণুগুলির প্রত্যেকটির ভিতরে ব্যক্তিত্ব আছে, জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার বিবেচনা আছে। প্রতিটি কণাতেই ইচ্ছাশক্তি আছে। এই ইচ্ছা জ্ঞানের ইচ্ছা, বিরাটের সাথে এক যোগাযোগে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা। কণা কণা ইচ্ছাকে যদি আজ্ঞাচক্রে একত্রিত করা যায়, তবে জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে। তখন বিশ্বরহস্যের দ্বার আপনি উন্মুক্ত হবে। কেন এসেছি? কোথা থেকে এসেছি? কোথায় যাব? সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি? কোনকিছুই আর অজ্ঞাত থাকবে না। জ্ঞানচক্ষু ফুটাবার ইচ্ছাটাই হ'ল চরম ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পরিপূর্ণ না হওয়া অবধি পরম তৃপ্তি আসবে না।

ইচ্ছাশক্তিটা এমন জিনিস, যার শক্তি প্রচণ্ড। সমস্ত জীবজগৎ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইচ্ছাশক্তি হতেই এসেছে। আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ইচ্ছাটা পরিপূরণের জন্য ব্যস্ত। জল তেষ্টা যখন পায়, মণ্ডা মিঠাই ভাল লাগে না। তখন একমাত্র জল দ্বারাই তেষ্টা মিটাতে হয়।

তেষ্টা হচ্ছে ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটা সকল জীবের মধ্যেই বিদ্যমান। আমাদের তেষ্টা আছে বলেই জল আছে। জন্ম হতেই এই তেষ্টা নিয়ে, ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আমরা এসেছি। সেই তেষ্টাকে, ইচ্ছাশক্তিকে যদি জাগ্রত করি, তবে তেষ্টা নিবারণের জন্য যে জল প্রয়োজন, তা বৃষ্টির মাধ্যমেই হোক বা খনন করেই হোক, আমরা জল পাবোই। কারণ মনের প্রাণের সাড়ায় সাড়া দিয়ে চলেছে এই জীবন, এই চেতন, এই চৈতন্য।

এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে অল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বশক্তিকে অর্জন করতে হলে, নিজেকে জেনে বিরাটকে জানতে বুঝতে হলে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত সুরকে আয়ত্ত করতে হলে চাই একজন পথ প্রদর্শক, একজন অনন্ত শক্তিসম্পন্ন গুরু অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ মহান। একমাত্র জন্মসিদ্ধ মহানের তত্ত্বে, দর্শনে, স্পর্শনে, শ্রবণে আমাদের ভিতরের বন্ধ দরজাগুলি খুলে যাওয়া সম্ভব।

জন্ম জন্মান্তরের বন্ধ দরজাগুলিকে উন্মুক্ত করতে, জীবকে আলো ও সুরের সন্ধান দিতে কৃপাময় জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর এই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট-ছোট পুস্তিকাকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের **৪১-তম** শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হলো **'জ্ঞানচক্ষু'**।

পরিশেষে জানাই, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদ তত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

*চপল মিত্র*

শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৮ *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

# হে গতিময়, হে স্রষ্টা, তোমার অনন্ত গতির পথে আমাদের নিয়ে যাও

**পার্ক ষ্ট্রীট, কোলকাতা**
**১০ই নভেম্বর, ১৯৭২**

দেরী হয়ে গেল। (বেদমন্ত্র...) সেই বেদের যুগে ছিল আদিবেদের সুর। সেই যুগের কথা, আদিবেদের কথা, যাহা আমি সবসময় বলে আসছি, সেই বিষয়েই বলবো কয়েকটি কথা। বেদ হচ্ছে মন, বেদ হচ্ছে পৃথিবী, বেদ হচ্ছে আকাশ, বেদ হচ্ছে ন্যায়, নিষ্ঠা, বিবেক। তখনকার সময়ে ঋষিরা সদাসর্বদা বেদের চর্চা করতেন। বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে করে তাঁরা সর্বত্র সর্বজায়গায় পৌঁছে দিতেন বেদের সুর। ঋষিরা বেদকে হজম করেই বেদজ্ঞ হয়েছিলেন।

আজকের সমাজে বেদের অর্থ বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু আবার দিন আসছে। বেদের সেই বার্তা আলো, জল, বাতাসের ন্যায় জীবের কাছে পৌঁছচ্ছে। সেই বেদ বিস্ফোরণের ন্যায় ফুটে বের হবে। বেদের সমাজ মধুময় হবে। আবার সেই বেদের যুগ ফিরে আসবে। যাতে আমরা সব কিছু নিয়ে বেদের সাড়ায় সাড়া দিয়ে, সবার ভিতরে সেই সাড়া জাগিয়ে তুলতে পারি, সবাই মিলে সেই চেষ্টা করবো। বেদ নষ্ট হয়নি। কেউ নষ্ট হয়নি। আজকের যে সমাজ, তাতে বেদের ন্যায়, নীতি সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেছে। আবার যদি সবাইকে সমনীতির কথা জানাতে পারি, বেদকে তুলে ধরতে পারি, তবেই সমাজে কল্যাণ আসবে,



শান্তি আসবে। কি ধর্মে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে আজ যে বিকৃত অবস্থা, যে ভেদাভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণই হচ্ছে বেদের অবমাননা।

বর্ত্তমান সমাজে একটা দল জনগণকে শোষণ করে সমাজকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু প্রকৃতির নীতিতে কেউ কাউকে দাবিয়ে রাখতে পারে না। চন্দ্র, সূর্যের অধিকার যার যার সমান অধিকার। আলো, জল, বাতাসের অধিকার নিয়েই আমরা সবাই এসেছি। যার যার প্রয়োজন অনুযায়ী বাতাস, আলো টেনে নিয়ে জীবন রক্ষা করছি। **আমার জন্য আর একজনকে ঠেলে ফেলে দেওয়া, ব্যক্তিগত নীতির জন্য, স্বার্থের জন্য অপরকে বঞ্চিত করা, প্রকৃতির নীতি বিরুদ্ধ। যারা এইভাবে সমাজকে চালনা করছে, বেদ তাদের শোষক বলেছে।** সমস্ত দেবতারা সমাজকে সমান সুরে দেখতে বলেছেন।

বেদ বলেছেন, ‘‘এই পৃথিবীতে সকলের সম অধিকার।’’ এই অধিকারবোধ সকলের মাঝে জাগিয়ে তুলতে হবে। সমাজে একছত্র আধিপত্য যারা করছে, তাদেরই বলা হয়েছে শোষক, তাদেরই বলা হয়েছে রাক্ষস। এদের বিরুদ্ধেই আমাদের অস্ত্র ধরতে হবে। সেইসব অসুরকে ধ্বংস করতে হবে। দেবদেবতাদের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বেদ আগেই সেকথা জানিয়ে দিয়ে গেছেন। তবু যদি আমাদের হুঁশ না হয়, আমরা সাবধানতা অবলম্বন না করি, তাহলে আমরাও অপরাধের ভাগী হয়ে যাব। সেটা তো ঠিক নয়। চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বেদের নীতির সাথে আমাদের নীতি মিলিয়ে, সমাজে যাতে বেদের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়, সেইভাবে কাজ করতে হবে। আমরা

সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করবো। সেখানে কোন দলাদলি নেই, বিবাদ নেই। এতে আছে শুধু সাম্যবাদের নীতি, সমসুরের নীতি।

আজ যেদিকে তাকাই, চারিদিকেই শুধু দলাদলি আর বিবাদ বিচ্ছেদ। স্বার্থান্বেষী শোষকের দল বেদের অর্থ বিকৃত করে সমাজকে পঙ্গু করে ফেলেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে নিরাশ্রয়ে কষ্টের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। ধর্মের ক্ষেত্রেও একই কথা; আলাদা কিছু নয়। ধর্ম শুধু চোখ বুঁজে বসে থাকা নয়। গেরুয়া পরে আশ্রমে থাকা নয়। মা, বাবা, আত্মীয় পরিজন ছেড়ে বনে চলে যাওয়া নয়। ধর্মের নামে পরগাছার মতো সমাজকে শোষণ করে, ধর্ম হতে পারে না। সমাজকে সম্পূর্ণ শিরোমণিতে রেখে, তবে হবে ধর্মের কথা। **শুধু দেবদেবতার কথা ধর্মের কথা নয়। সকলের শুভ চিন্তায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে, সকলের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করে, সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করে, একান্নভুক্ত পরিবারের ন্যায় সমাজকে যে দেখবে, তার ভিতরই ধর্মের সুর জেগে উঠবে। সেটাই হবে প্রকৃত ধর্মের কথা।**

বারে বারে বলছি একই কথা। সমাজ আজ অধঃপতনের চরম সীমায় দাঁড়িয়ে আছে। শোষণকারীদের দুর্নীতির বাসাগুলো সব ভেঙে দিতে হবে। এইভাবে যদি সমাজ চলে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হবে এবং এইভাবে চলতে চলতেই আসবে নবনীতির কথা। বেদ আগেই তার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। (বেদমন্ত্র...)

ধর্মের প্রথম কথাই হল, কেউ অনাহারে থাকবে না। বেদ বলেছেন, দেশে কোন অভাব থাকবে না। রাজনীতির গোলযোগে আমাদের দেশে অভাব সৃষ্টি হয়েছে। কৃষকরা ক্ষেতে খাটছে, শ্রমিকরা খাটছে। চাষীরা চাষ করছে, আর শোষকরা, মজুতদাররা



কাওলাতি করে অভাব সৃষ্টি করছে। বেদ বলছেন, ''ঐসব শোষক অসুরদের দূরে সরিয়ে দাও। চাষীদের হাতে সব ছেড়ে দাও। দেখবে, চাল, দুধ, মাছের কোন অভাব হবে না।'' সমাজে অভাব সৃষ্টি করছে কারা? ঐ সমস্ত শোষক, মজুতদারেরা, যারা সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনে গুদামজাত করে অধিক মূল্যে আস্তে আস্তে ছাড়ছে। বেদ বলেছেন, **''ঐ সমস্ত দুর্নীতিকারী, শয়তানদের টুঁটিগুলো চেপে ধর। তাদের হাত কেটে দাও। দেবদেবতাদের অস্ত্রগুলো অসুর দমনে ব্যবহার করো।''** আমাদের দেবতাদের মূর্ত্তির মাধ্যমে সেই ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে।

চন্দ্রে সূর্যে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে প্রকৃতির যে নিয়ম যেভাবে রয়েছে, সেই নিয়ম সেইভাবে কার্যকরী হলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। আমরা যেইভাবে গর্ভে ছিলাম, গর্ভস্থ শিশু যেই চিন্তায় যোগাসনে সমাধি অবস্থায় নিবিষ্ট থেকে, ভূমিষ্ঠ হয়ে সবকিছু পেয়ে যায়, আমরাও যদি যোগাসনে স্মরণে মননে মহাকাশের চিন্তায় সেইভাবে নিবিষ্ট থাকতাম, এই পৃথিবীর সব কিছু সমস্যার নিশ্চয়ই সমাধান হয়ে যেত। আর কোন খাওয়াখাওয়ি মারামারির প্রয়োজনই হত না। কিন্তু আমরা তা না করে, ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নিবারণের আশায় 'হে খাদ্য, হায় খাদ্য' করে চিৎকার করছি। 'এই চাই', 'সেই চাই' বলে চিৎকার করেই যাচ্ছি। এভাবে চিৎকার করাতে হয়েছে কি, যিনি দেবেন (স্রষ্টা) তিনি বলছেন, ''চিৎকার তো করছো। আমার আর কিছু করার নেই।'' সারাদিন চিৎকার করে হয়তো একমুঠো পেল, তাতে উদরও ভরলো না। আর তার ঊর্দ্ধেও উঠতে পারলো না।

স্রষ্টা দেখলেন, জন্মের সাথে সাথে জগতের সবাই ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা নিবারণের জন্য চিৎকার করে চলেছে। তিনি

বলছেন, ''আমি যে নিয়ম করে রেখেছি, আমার নিয়ম যদি পালন না করে, আমি আর কি করবো?''

আজ দেশে সর্বত্র হাহাকার। আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সেই বিরাটের সাথে যোগাযোগে যুক্ত হয়ে থাকা। যেভাবে আমরা এসেছি, যে যোগ প্রক্রিয়ার লাইন দিয়ে আমরা এসেছি, সেই পথের পথিক হিসাবে কাজ আমরা খুব কম করি। সূর্য যেমন দিনরাত আলো বিতরণ করে চলেছে, আমরা যদি দিবারাত্র সূর্যের চিন্তা, আলোর চিন্তা করি, আমাদের ভিতরে আলো প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই আমাদের কাজ হচ্ছে, যোগ অভ্যাসে যুক্ত হয়ে সেই যোগকে লাভ করা। যে আসন হতে আমরা এসেছি, সেই আসনে নিবিষ্ট হওয়া। সময় চলে যাচ্ছে। দিন চলে যাচ্ছে। চোখের সামনে মৃত্যুর জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত দেখেও আমরা ভুলে যাই। সব জেনেও আমরা সঠিক পথে চলি না।

স্রষ্টার বৃহত্তম ক্ষমতা আমাদের মধ্যে রয়েছে। সেই সহজাত বস্তুকে সহজে পালন করলে আমরা সব কিছু পেতে পারি। প্রকৃতির নিয়মের বশে বশীভূত হয়ে আমরা যদি নীরবে কর্ম করে যাই, সেইভাবে কর্মের দ্বারা আমরা যদি অগ্রসর হই এবং প্রকৃতির সহজাত বস্তুকে সহজে পালন করে যাই, তাহলে অনিবার্যভাবে জেগে উঠবে ভিতরের সুর। যেভাবে ফুল ফুটছে, ফুল ফোটার মতো ভিতরের শক্তির স্ফূরণ হবে। জীবনের চলার পথে যত বাধা, অন্তরায়— যা কিছু আসে আসুক, ক্ষতি নাই। এগুলো কিছুই করতে পারে না, পারলেও সাময়িকভাবে। সাময়িক অন্তরায় তোমাদের কর্মে সব সরে যাবে। **ছাতা দিয়ে তুমি নিজেকে বৃষ্টির হাত হতে রক্ষা করতে পারো, কিন্তু সমস্ত জগতের বৃষ্টিকে ছাতা দিয়ে রক্ষা করতে পারো না। যত বাধা,**



**অন্তরায় আসুক না কেন, সকলের সম্মিলিত কর্মের দুর্বার স্রোতে সব বাধা অপসারিত হয়ে যাবে।** (বেদমন্ত্র...)।

আমার (শ্রীশ্রীঠাকুরের) যখন ২/৩ বছর বয়স, তিতাস নদীর পাড়ে গিয়ে বসে থাকতাম। তিতাস নদী (অধুনা বাংলাদেশে) ছিল মেঘনা নদীর একটি শাখা, অনেকটা অর্ধচন্দ্রের মতো। সেই সময়েই অনেকে আসতো আমার কাছে। সুরসম্রাট আলাউদ্দিনের দাদা আফ্‌তাবুদ্দিন আসতেন। আর ছিলেন লব বাবু— মস্ত বড় সাধক। এরা দিনের পর দিন আমার কাছে এসে বসে থাকতেন। ঐ বয়সেই লোকের ভিড় হতো। অনেকে আসতো, আমার কাছে জানতে চাইতো। প্রভাতের সূর্য ক্রমশঃ ক্রমশঃ উঠছে, আমি সেইদিকে তাকিয়ে থাকতাম। যখন আর তাকানো যায় না, বাড়ী ফিরে আসতাম। এই যে সহজ চিন্তা, প্রতি মুহূর্ত্তের চিন্তার মধ্যে একটা অদ্ভুত চিন্তা আমার ছিল, আজ সে কথা মনে হচ্ছে। পাড়ার কত ছেলেপিলে ছিল। আমি তাদের সঙ্গে মিশতাম, খেলতাম। কিন্তু সবসময় সব কিছুর মধ্যে আমার ছিল একটি মাত্র চিন্তা। আমার চিন্তাধারা সদা সর্বদা থাকতো এই মহাশূন্যে। আমার চিন্তাভাবনা, ধ্যান ধারণা, সব কিছুর মধ্যে ঐ চিন্তাই থাকতো, সে কথাই বলছি। সেই চিন্তাধারা শুধু আমার মধ্যেই ছিল না; সে চিন্তা সবার ভিতরেই ছিল— জাপ্য অবস্থায়। তবে আমার মধ্যে জন্মের সাথে সাথেই ফুটে উঠেছিল।

আমার শিশুবয়সের যে সত্যিকারের সুর, শিশু বয়সের যে সেই সাধনা, আজ সেকথা মনে পড়ছে। আমার সাথে যারা খেলাধুলা করতো, আমি তাদের কথা ভাবতাম, 'কেন তারা এইরূপ চিন্তা করে না?' তাদের চিন্তাগুলো ছিল সীমিত। বন্যার সময় খাল, বিল, নদী নালা সব এক হয়ে যায়। **যখন তোমার**

**সত্তা, তোমার জ্ঞান, বুদ্ধি আকাশ, বাতাস, জলের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়, তখন আলাদা করে ভাবনা আর কিছু থাকে না। তখন কোন ভেদাভেদ দেখতে পেতাম না। যেটা দেখি, সবটার মধ্যে যেন আমাকেই খুঁজে পাচ্ছি।** একবার দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বিসর্জন দেখতে যাই। প্রতিমাগুলো যখন জলে ডুবে গেল, কাঁদতে লাগলাম। কেন কাঁদলাম, জানি না। হঠাৎ চোখে জল এসে পড়লো। সবাই বলছে, 'কাঁদছো কেন?' ছোট্ট মানুষতো। কিছু উত্তর দিতে পারছি না। আকুল হয়ে কেঁদে যাচ্ছি।

আজ ২৩শে কার্ত্তিক। ছোটবেলার কথা খুব মনে পড়ছে। আমি ভাবতাম, আমার মতো বাচ্চা যারা, সবার ভিতরই এই অবস্থা। হঠাৎ দেখি, আমার ভিতরে ফুটতে আরম্ভ করেছে। আমি আমার খেলার সাথীদের জিজ্ঞাসা করতাম, 'জন্মের আগে কোথায় ছিলি জানিস্ না?'

—না।

একবছর আগে কোথায় ছিলি, মনে আছে?

—হ্যাঁ।

একবছর আগের কথা খেয়াল থাকলে, একথা মনে থাকবে না কেন? কিন্তু যাকেই জিজ্ঞাসা করি, কেউ বলতে পারে না। তারপর লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছি, বেশীদিন নেই। বলি, 'এ' তো আর দুবছর আছে। 'ও' আছে চার বছর, 'সে' ছয় বছর— বলতে আরম্ভ করেছি। এর ফলে হল কি, ভিড় বাড়তে লাগলো। আরতো বলা যায় না।

আর একটু বড় হয়েছি। আমি দেখছি, মাষ্টার মশায় আর দেড় বছর আছেন। সহপাঠীদের বলি, ''যা কিছু গ্রামার



(Grammar) জানার জেনে নাও। মাষ্টারমশায় আছেন আর দেড় বছর।''

ক্রমে মাষ্টার মশায়ের কানে কথাটা উঠলো। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি একথা বলেছ?'

**আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, আমি জানি। আর আপনি মাষ্টারমশায়, আপনি এটা জানেন না? আপনি কবে রিটায়ার্ড হবেন, জানেন?**

**—তা জানি।**

**—আর আপনি দেড় বছর আছেন, সেটা জানেন না? আমি আরও আশ্চর্য হয়ে বলি।**

—তাতো জানি না।

তারপর মাষ্টার মশায়ের স্ত্রী বাড়ি এসে কান্নাকাটি করছে। কি ফ্যাসাদে পড়লাম। আমি কি সেভাবে বলেছি? বন্ধুদের বলেছিলাম, ''I am going. He is going. Tense গুলো ভাল করে বুঝে নে। মাষ্টারমশায় আর দেড় বছর।'' ঠিক দেড় বছর পর মাষ্টারমশায় গেলেন। পরে তার ছেলে মাষ্টার হয়ে এসেছে। আর একজনকে বলেছি, 'আর তো দু'বছর আছে'। তাই হয়েছে। এভাবে বলাতে কথাটা ছড়িয়ে গেছে। শেষবেলায় হেডমাষ্টার এসে আমায় ধরেছে। আমার বাড়ীতে এসেছে।

আমি মাষ্টার মশায়কে বলি, ''আপনি ট্রেনে যাবেন না। ট্রেনে গেলে stabbed হবেন।''

মাষ্টার মশায় দীনেশ সেন নাম, ব্রাহ্মণ বেড়িয়া থেকে ময়মনসিংহ যাচ্ছিলেন। চারিদিকে গোলমাল শুরু হয়েছে। তিনি

ট্রেনে রওনা হলেন। Stabbed হয়ে গেলেন। মরার সময় বলছেন, ''সে (শ্রীশ্রী ঠাকুর) তো বলেছিল।'' আমার তখন ছয়/সাত বছর বয়স। চারিদিকে হৈ হুল্লোড় পড়ে গেছে। তখন যা বলতাম, যা করতাম, তাই হয়ে যেত।

আমাদের স্কুলের সেক্রেটারীর বাড়ীর কাছে এক বিরাট বটগাছ আছে। বলে, ''ঐ বটগাছে পরী আছে। এটাকে কি করে সরানো যায়?''

আমি দেখি, পরী টরী কিছুই নাই। সেক্রেটারী আমাদের স্কুলে এসে হাজির। আমাকে বলে, ''আমার বাড়ীতে কীর্ত্তন হবে। তুমি যাবে।''

আমি বলি, ''আইচ্ছা। আমি যামু (যাব)।'' সেক্রেটারীর কথায় তার বাড়ীতে গেলাম কীর্ত্তন করতে। আমি বললাম, ''কাল যদি বৃষ্টি হয়, তাইলে (তাহলে) মনে করবেন, সব পরিষ্কার হয়ে গেছে।''

তার পরদিন তো বৃষ্টি হল। কিন্তু পরে তো আর বৃষ্টি হয় না। আমার বাবা জমিদারের সেরেস্তায় কাজ করতেন। তারা সব আমার কাছে আইছে (এসেছে)। আমারে মাঠে নিয়া গেছে। ঠা ঠা পড়া রৌদ্রে মাঠে বসে রইলাম। তারা আমাকে বললো, বৃষ্টি আনতে।

আমি বলি, ''তোরা একটা লোককে ডাকলে আসে। আর বৃষ্টিকে আনতে পারিস না? বসে বসে 'আয় বৃষ্টি, 'আয় বৃষ্টি' কর।'' ব্যাপারটা হচ্ছে, **Will-টা, ইচ্ছাশক্তিটা এমন জিনিস, যার শক্তি প্রচণ্ড। সমস্ত জীবজগৎ, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ইচ্ছাশক্তি হতেই এসেছে। জলের সাথে, বাতাসের সাথে আমাদের**



**ইচ্ছাশক্তি (will force) ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। প্রতিটি ইন্দ্রিয় তার নিজ নিজ will-টা, ইচ্ছাটা পরিপূরণের জন্য ব্যস্ত।** জল তেষ্টা যখন পায়, তখন রসগোল্লা দিলে ভাল লাগবে না। জল তেষ্টার সময় আর কোন কিছুই ভাল লাগবে না। যত সুরম্য প্রাসাদেই তোমাকে রেখে দিক না কেন, তৃষ্ণার জল না পেলে তৃপ্তি হবে না। যুদ্ধের সময়ে বার্মা থেকে আসার পথে হাজার টাকা এক গ্লাস জলের জন্য দিতে হয়েছিল।

তেষ্টা হচ্ছে ইচ্ছা। এই ইচ্ছা সবার ভিতরে আছে। তেষ্টা পেলে আমরা জল পান করি। আমাদের ইচ্ছাটা, তৃষ্ণাটা আছে বলেই জলও আছে। আর জল আছে বলেই আমরা আছি। জন্ম হতেই এই তেষ্টা নিয়ে, ইচ্ছাশক্তি নিয়ে আমরা এসেছি। সেই সাধনা আমাদের মধ্যে রয়েছে। সেই তেষ্টাকে (ইচ্ছাশক্তিকে) যদি জাগ্রত করি, সেই জল বৃষ্টির মাধ্যমেই হোক, আর খনন করেই হোক, আমরা আনতে পারবো। **মনের প্রাণের সাড়ায় সাড়া দিয়ে চলেছে এই জীবন, এই চেতন, এই চৈতন্য। মনে প্রাণে আমরা যদি চাই, আমরা সাড়া দিতে শুরু করলে, 'সাড়াওয়ালা' ঠিক সাড়া দেবেন, ঠিক আসবেন।** আসুন, আমরা সবাই মিলে বসি, 'হা জল', 'হে জল' করি, দেখি বৃষ্টি আসে কি না।

তখন সবাই মিলে বসে এক একবার 'হা জল', 'হে জল' বলে, আর আকাশের দিকে তাকায়।

আমি বলি, ''উপরে তাকালে হবে না। নীচের দিকে তাকান।'' কিছুক্ষণ পরে ছোট একটু মেঘ আসাতে যেই একটু ছায়া পড়েছে, তাতে বৃষ্টি হবে ভেবেই সবাই উপরের দিকে তাকিয়েছে।

আমি বলি, ''কেন আকাশের দিকে তাকালেন? এতে হবে না।''

তারা মাটির দিকে মুখ করে আছে আর 'হা জল', 'হে জল' বলছে। কিছুক্ষণ পর দু'চার ফোঁটা পিঠের উপর পড়ছে। তখন সকলে আইতাছে, আইতাছে (আসছে, আসছে); কুমিল্লার ভাষা তো, চিৎকার করে উঠেছে।

আমি বলি, ''কেন বললে? আর পড়বে না।''

তারা — আনন্দে বলে ফেলেছি।

তোমাদের বসাতেই পারলাম না সাধনায়। আমি (শ্রীশ্রীঠাকুর) যতক্ষণ থামতে না বলি, বলে যাও।

তারা নীচের দিকে তাকিয়ে 'হা জল', 'হে জল' করছে। হাত নাড়ছে।

আমি বলি, ''হাত নাড়বে না। কচ্ছপের মতো গুটিয়ে পড়ে থাকবে।''

কিছুক্ষণ পর শিলা পড়তে আরম্ভ করেছে। বৃষ্টিটা জমাট বেঁধে গেছে। ফলে, 'হা জল', 'হে জল' করবে কি, তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, ''গোঁসাই, মারা পড়বো নাকি?''

আমি বলি, ''একটুও কথা বলবে না। একটু পড়ে গলবে।'' শেষে আস্তে আস্তে ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। সব ভাসিয়ে দিয়েছে। আনন্দে সব আত্মহারা হয়ে গেছে। কাজেই দেখ, এই ইচ্ছাশক্তিটা will-টা কিভাবে কাজ করলো।

গাছপালা যেখানে, বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে। পাহাড় যেখানে,



বেশী বৃষ্টি হয় সেখানে। এদের একটা নিজস্ব আকর্ষণী শক্তি আছে। উঁচু জায়গায় মেঘ এসে পাহাড়ে বাড়ি খায় বলে বেশী বৃষ্টি হয়। **প্রকৃতি থেকে সেই আকর্ষণে বৃষ্টি হয়। যেই নিয়মে বৃষ্টি হয়, যে কারণে বৃষ্টি হয়, সেই কারণগুলো জানতে পারলে, হু হু করে বৃষ্টি পড়বে।** প্রকৃতির নিয়ম এমন সুন্দর, এমন সহজ।

প্রকৃতি বলছেন, তোমাদের দুটো হাত দিয়েছি। দুটো পা দিয়েছি। নাক, কান, চোখ, মুখ সব দিয়েছি। তোমার ইচ্ছাতে এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিচ্ছ। তোমার এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সেবা করছে। এক হাত দিয়ে আর এক হাত চুলকাচ্ছ। কি মিল দেখতো। তোমার চোখ, কানের মতো এই আলো, জল, বাতাস একই অঙ্গের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে রয়েছে। প্রকৃতি বলছেন, ইচ্ছাশক্তিটা, Willforce টা ব্যাপকভাবে তোমার ভিতরে কাজ করছে।

**এই বাতাসটা তোমার দেহের একটি অঙ্গের ন্যায় কাজ করছে। কারণ দেহের সঙ্গে যা যুক্ত, তাই দেহের কাজ করবে। কি কাজ করবে? যেই জিনিস যে বস্তু ছাড়া তুমি চলতে পারবে না, সেটাই তোমার দেহ।** বাতাস ছাড়া তুমি চলতে পারবে না, জল ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। আলো ছাড়া তুমি চলতে পারবে না। তাহলে তোমার দেহ কত বড় হয়ে গেল। এই শীতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় রৌদ্র পোহাতে আরাম পাচ্ছ। আবার প্রচণ্ড গরমে ঠাণ্ডা বাতাস— কি আরামদায়ক। এগুলো সবই তোমার অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু সেটা একটু আলাদা বলে ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে।

**তোমার দেহের হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গগুলো যেভাবে**

**তোমার কথা শোনে, এই বিশ্বে তোমারই অঙ্গস্বরূপ যা যা আছে, সবাই তোমার কথা শুনবে।** তবে নিজের ছেলের চেয়ে ভাশুরের ছেলে, দেবরের ছেলে একটু অন্যরকম। আবার দেবরের ছেলে হতে ভাইয়ের ছেলেকে একটু ভালভবে বলা যায়। কাউকে কোন কাজের কথা বলার আগে যদি চিন্তা হয়, 'ও কি মনে করবে?' সেখানে সহজে কাজ হয় না। মনে কর, তোমার নাক চুলকাচ্ছে। কথাবার্ত্তা নেই চুলকিয়ে দিলে। তোমার মনের মধ্যে সাড়া দিচ্ছে, 'আমাকে চুলকিয়ে দাও।'

—আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি চুলকিয়ে দিলে। ইচ্ছাশক্তি এভাবেই কাজ করছে।

মীরকাডিম নামে একটি জায়গায় ঘরে ঘরে Pox হচ্ছে। বসন্তের মড়ক লেগে গেছে। ষ্টীমার নৌকা কিছু ভিড়ে না ভয়ে। সেখানে আমাকে নিয়ে গিয়ে নাবিয়ে দিয়েছে। চারিদিকে কেবল মরা। সবাই দেখে, লালপাড় শাড়ী পরা একজন মহিলা ঝাঁট দিচ্ছে। আমি গেলাম। আমার ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। অমল বলে একটি ছেলে ছিল আমার সঙ্গে। তাকে বলেছি, জলের জন্য। হঠাৎ দেখি, একজন একটা ডাব নিয়ে এসে হাজির। আমাকে বলছে, ''আপনি ডাব চেয়েছেন? ঐ লালপাড় শাড়ী পরা মহিলা পাঠিয়ে দিয়েছে।''

আমি মনে মনে জল চেয়েছি, 'তুই ব্যাটা, কে?' অমলকে বলি, 'অমল, এবার Pox হবে।' বলতে বলতে অমলের গায়ে কয়েকটা বেরিয়ে গেছে। আমারও গা ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। কি করি? তখন একটু এইসব করতাম। অমলকে বালি নিয়ে আসতে বললাম। আমি বালি ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিলাম।



ভদ্রমহিলাকে ডাকতে বললাম। সে আমার সঙ্গে দেখা করবে না মনে হয়। অমলকে বললাম, ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর, 'এদের এইরকম সাজা দিয়ে লাভ কি?'

অমল বলে, ''ভদ্রমহিলা মাথা নেড়েছে, আর এমন করবে না। খুব খুশী হয়েছে।''

আমি সবাইকে বলি, ''তোরা পুজো টুজো দিয়েছিস্ ঐ ভদ্রমহিলাকে? সবাই মিলে পূজা দাও।'' Pox বন্ধ হয়ে গেল।

ছোটবেলায় একবার বাবার সঙ্গে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি হাতীর শুঁড়ের মত একটা কিছু নেমে এসে সব জল টেনে নিচ্ছে। কচুরী পানা টানা সব নিয়ে চলে গেল। এটা যদি দেহ হতে পারে, সেখানেও প্রকৃতির মাঝে ইচ্ছাশক্তি কাজ করছে। ঐরকম হাতীর শুঁড়ের মতো একটা দেহ নিয়ে নেয়। আস্তে আস্তে করে দেহটা আবার লীন হয়ে যায়।

আমাদের জীবনে যত কিছু কথাবার্ত্তা, আদর আপ্যায়ন, 'আসুন, বসুন', সবটাতে ইচ্ছাশক্তি কাজ করে যাচ্ছে। এই ইচ্ছাটাকে, কণা কণা ইচ্ছাকে যদি একত্র পুঞ্জীভূত করো, তাহলেই বিরাট হয়ে যায়। যেমন কণা কণা বালুকণা একত্রিত হয়েই দেশ গড়ে ওঠে। আমাদের ইচ্ছাটা অগণিত ইচ্ছায়, কণা কণা ইচ্ছায় ছড়িয়ে গেছে বলে, তেমন কাজ হচ্ছে না। কিন্তু সব কণাতেই ইচ্ছা জেগে আছে। নানাদিকে ছড়িয়ে যাওয়াতে ইচ্ছাগুলি টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। সমস্ত ইচ্ছাকে যদি এক জায়গায় রেখে দিতে পার, তাহলে নদীর চরের মতো চর পড়ে যাবে। বিশাল দেশ গড়ে উঠবে। টিউব ওয়েলে কি করে? এতটুকু একটা আট হাত পাইপ লাগিয়ে গেছে। তাতে বাবা,

পোলা (ছেলে) নাতি পর্যন্ত সমানে জল টানছে। এতটুকু একটা গর্ত্তের মত মুখ, তাতে সমানে জল আসছে।

নামটা হচ্ছে সেইরকম। এই যে হরি হরি বলে দু'হাত তুলে চিৎকার করে করে পথে ঘাটে নাম করছে, তাতে কি হচ্ছে? নামে নামে ঐ ইচ্ছার জায়গায় সহস্রারে একটা ছিদ্র হয়ে যায়। তারপর এমন একটা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়ায় যে, তখন ঐ সহস্রারে জলের মতো অনর্গল ধারায় নামের ধারা, আলোর ধারা আসতে থাকে। যতদিন না সেটা হয়, নাম করে যেতে হবে। দেহের ভিতরে অনন্ত কোটি অণু পরমাণুর প্রত্যেকটির ভিতরে ব্যক্তিত্ব আছে; জ্ঞান বুদ্ধি বিচার-বিবেচনা আছে। প্রতিটি কণাতেই ইচ্ছা জেগে আছে। সেই ইচ্ছা কিসের ইচ্ছা? জ্ঞানের ইচ্ছা, বিরাটের সাথে এক যোগাযোগে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা। কণা কণা ইচ্ছাকে যদি আজ্ঞাচক্রে (ত্রিনয়নে), সহস্রারে একত্রিত করা যায়, তাহলেই বিরাট হয়ে যাবে, জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে। তখন বিশ্বরহস্যের দ্বার আপনিই উন্মোচিত হবে। কেন এসেছ? কোথায় যাবে? সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য? কিছুই আর অজ্ঞাত থাকবে না। জ্ঞানচক্ষু ফুটাবার ইচ্ছাটাই হল চরম ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পরিপূর্ণ না হওয়া অবধি পরম তৃপ্তি আসছে না। তৃষ্ণা (ইচ্ছা) নিবারণ হচ্ছে না।

কীর্ত্তন যে করে, তাতে খোল, করতাল, মৃদঙ্গ, বাঁশী— এত বাদ্যযন্ত্র কেন? সব বাদ্যযন্ত্রে ইচ্ছাগুলি যাতে ঐকতানে পরিণত হয়, একত্র পুঞ্জীভূত হয়, তার জন্যই এই ব্যবস্থা। নামের ধারা তখন ঊর্দ্ধরেখায় আজ্ঞাচক্রে, সহস্রারে অদ্ভুতভাবে বিকশিত হতে থাকে, অফুরন্ত ভাণ্ডারে প্রস্ফুটিত হয়, জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। এই যে প্রস্ফুটিত শেফালী ফুল, একটি বীজের কত ক্ষমতা। কত অজস্র শেফালী ফুল, দিনের পর দিন ঝরে পড়ে যাচ্ছে, তার



সুগন্ধে চারিদিক মোহিত করে দিচ্ছে।

প্রকৃতির সেই বিরাট আকর্ষণের সাথে যুক্ত হয়ে বীজমন্ত্র জপ করে গেলে, উচ্চৈঃস্বরে নাম গান করলে, কীর্ত্তন করলে, তখনই জ্ঞানচক্ষু ফুটতে শুরু করবে। বীজের স্বরূপ ফুলের মতন বিকশিত হয়ে তোমার উপরে বর্ষণ হবে, বৃষ্টির মতন বর্ষণ হবে। এক স্নিগ্ধভাবে গভীর ভাবে তুমি ভরপুর হয়ে যাবে।

অবতাররা মহানরা কি করেন? তাঁরা সাগর (বিরাট) হয়ে সাগরের (বিরাটের) সাথে লীন হয়ে রয়েছেন। তোমরাও সাগরেই রয়েছ। কীর্ত্তন করতে করতেই বিরাটের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এখানে সীমারেখার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছি আমরা। ভিতরে যে বীজ, যে মূলমন্ত্র, যে রক্তকণিকা রয়েছে, ভিতরে যে সুপ্তধ্বনি আছে, আপনি তার স্ফূরণ হবে। সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে বীজের মধ্যে। আপনি তার বিকাশ হবে। বীজ আপনি ফুটবে, ফুটতে বাধ্য। বীজ (জ্ঞানচক্ষু) ফুটবেই অনিবার্যভাবে। **ফুটবার জন্যই জন্ম। সবসময় কাজ করে যাও। জেনে হোক, না জেনে হোক, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, বুঝে না বুঝে যেভাবে হোক, নাম করে যাও। তোমরা ভরপুর হয়েই আছ। কারণ তোমরা ভরপুর হতে এসেছ। ভরপুর হয়ে রয়েছ বলে তোমাদের পতন হবে না।**

জল সাগরেই রয়েছে। সাগরের জল নিদাঘের রাগে উপরে টেনে নিচ্ছে। কয়েক সহস্র সাগরের জল রয়েছে মহাকাশে মহাশূন্যে। সাগর বলছে, ''আমি যদি উপর দিয়ে যাই, তোমরা তো থাকবে না। তোমরা কিরকমভাবে আমাকে (জল) পেতে চাও? তোমাদের জলদান করে আমি চলে যাব। তোমাদের সেবার ভিতর দিয়ে আমি চলে যাব। তোমরা যেখানেই খনন কর, সেখানেই আমাকে (সাগরকে) পাবে। আমি সমাজের ভিতর

দিয়ে কাজ করে যাব। তাতে হয়তো আইনের ব্যতিক্রম হবে। সারাক্ষণ বৃষ্টি হলে বন্যা হবে। তাতে মাটি উর্বরা হবে। আকাশ হতে যে বর্ষা নামে, তাতে গাছপালা সজীবতা ফিরে পাবে।''

অবতার, মহান ব্যক্তিদের নামে প্রেমে আকাশ বাতাস ভরপুর হয়ে রয়েছে। তাঁদের আশীর্বাদ আকাশে বাতাসে ভেসে রয়েছে। তোমাদের আপনি বিকাশ হবে। আপনি বিকাশ হবে। আপনি ফুটবে। নদীর এপাড় ভাঙ্গে, আর এক পাড় গড়ে। সর্বদা বলবে, ''হে গতিময়, হে স্রষ্টা, তুমি এপাড় ভেঙ্গে, ওপাড় গড়ছো। বৃহৎ কল্যাণে, বৃহৎ উদ্দেশ্যে তোমার অনন্ত গতির পথে আমাদের নিয়ে যাও। আমাদের আশীর্বাদ করো।''

তোমাদের উপরে আশীর্বাদ ঠিকই আছে। প্রকৃতির অনন্ত ইচ্ছাশক্তি নানাভাবে কার্যকরী হয়ে যাচ্ছে। কখনও ছুরিকাঁচির ভিতর দিয়ে, কখনও অপারেশনের ভিতর দিয়ে, আবার কখনও মধুময় হয়ে কাজ করছে। **বিরাটের আশীর্বাদ আছে বলেই মহাশক্তি কাজ করে যাচ্ছে। ঊর্দ্ধলোকে পরমানন্দের মহাসাগরের যে সৃষ্টি হল, মস্তিষ্কে সহস্রারের আকর্ষণে উর্দ্ধ হতে বর্ষণ হবে সেই পরমানন্দের ঢেউ।** আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



# বাংলাদেশে আমি তিনটে ডায়মণ্ড ফেলে এসেছি

**লেকটাউন, কোলকাতা**
**২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯২**

পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ বহু ক্লাসে, বিভিন্ন সময়ে ভক্তদের কাছে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন তাঁর বাল্যবয়সের কথা ও কৈশোর জীবনের কথা। বাংলাদেশের উজানচর কৃষ্ণনগরের কথা, দোগাছি (তাঁর মামাবাড়ী), মেদিনীমণ্ডল (পৈত্রিক বাড়ী) ও ঢাকার স্বামীবাগের বহু কথা তিনি বলেছেন। কথা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, ''বাংলাদেশে **আমি তিনটি diamond (হীরা) ফেলে এসেছি। তাদের কঠিন শাস্তি দিয়ে এসেছি। আইনের ঘরে বেঁধে রেখে এসেছি। তারা যতদিন বেঁচে থাকবে, আমার সাথে দেখা করতে পারবে না। আমার কাছে আসতে পারবে না।** আমার আদেশ পালন করে, আমার উপদেশ ও নির্দেশ মাথায় নিয়ে তাদের চলতে হবে। তারা সেই কঠিন নিয়মই মাথা পেতে নিয়েছে এবং আজ অবধি প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে।'' মৃত্যুর পরে তাদের নিয়ে যেতে, সেই অনন্তধামে পৌঁছে দিতে আমার কোন অসুবিধাই হবে না। আমি ইঞ্জিন হয়ে অতি সহজেই তাদের পৌঁছে দিতে পারবো। এখনও পর্যন্ত যা দেখছি, ওরা ট্রেনের 1st class compartment-এ অপেক্ষা করছে। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের এই পরম তিনজন ভক্ত, তিনটি diamond, হেনা, শেফা ও জয়ন্তী।

এদের মধ্যে হেনা হচ্ছেন ঢাকা নবাব বাড়ীর মেয়ে।

পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের স্কুলের বন্ধু মান্নার দিদি। বয়সে শ্রীশ্রীঠাকুরের চেয়ে বড়। হেনা পরমা সুন্দরী। বীণা হাতে দিলে মনে হবে যেন, সাক্ষাৎ সরস্বতী। তিনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না। বালক ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি, জ্ঞানগরিমা, উজ্জ্বল মূর্তি এবং সর্বোপরি তাঁর মধুর ব্যবহারে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে বালক ঠাকুরের চরণে আত্মোৎসর্গ করে তিনি দীক্ষাগ্রহণ করেন। তিনি লালপাড় শাড়ী পরতেন। সমস্ত কোরাণশরীফ ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ। মুসলমানের মেয়ে হয়েও সমস্ত ভগবদ্‌গীতা তিনি কণ্ঠস্থ করেছিলেন। সমস্ত ভোগ, ঐশ্বর্য ত্যাগ করে শুদ্ধ পবিত্রভাবে তিনি জীবনযাপন করতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিটি নির্দেশ নিষ্ঠাভরে পালন করে চলতেন। 'বালক ঠাকুর' তাঁকে (হেনাকে) কথা দিয়েছিলেন যে, ইহ জীবনে তাঁর সাথে আর দেখা হবে না। একমাত্র তার (হেনার) মৃত্যুর ১৫ মিনিট পূর্বে তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) তার (হেনার) সাথে দেখা করবেন ও কথা বলবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে মান্না নবাব বাড়ীতে নিয়ে যেতেন। মান্নার বাবা শ্রীশ্রীঠাকুরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর যে ঘরে বসতেন, হেনাদের ঘরের যে সব জিনিস তিনি স্পর্শ করেছেন, কথাচ্ছলে যেখানে হাত রেখেছেন, যেখানে তাঁর পাদস্পর্শ হয়েছে, সেই ঘরখানি হেনা ঠিক সেইভাবে রেখে দিয়েছিলেন। ঐ ঘরের এককণা ধুলিও কারও সরাবার হুকুম ছিল না। সেই ঘরখানি ঠিক সেইভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের শেষ স্পর্শধন্য হয়ে রক্ষিত হয়েছে হেনার তত্ত্বাবধানে। হেনার নিজস্ব পরিচারিকা ছিল ৩/৪ জন। তিনি সারাদিনে বেশী কথা বলতেন না। তিনি (হেনা) না ডাকলে এই পরিচারিকাদের কারও তার সামনে আসার অধিকার ছিল না। তিনি (হেনা) যাকে ডাকবেন সে (পরিচারিকা) আসবে



এবং প্রয়োজনীয় কাজটি করে দিয়ে চলে যাবে, এটাই ছিল নবাব বাড়ীর হুকুম। হেনা বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের গভীর চিন্তায়, জপে, ধ্যানে তিনি মগ্ন থাকতেন। আর মাঝে মাঝে শেফা ও জয়ন্তীর সাথে যোগাযোগ হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় ও আলাপ আলোচনায় মেতে উঠতেন।

শেফা ও জয়ন্তী ছিল বালক ঠাকুরের (শ্রীশ্রীঠাকুরের) পাঠশালার সাথী। তাঁরা একদিনে কলাপাতায় অ আ লিখেছেন। শেফা জমিদার বাড়ীর (হাজরা বাড়ীর) মেয়ে। তাদের বাড়ীর গৃহদেবতা ছিল বালগোপাল। তার নাম ছিল 'দধিবাহন'। ঐটুকু বয়সেই শেফা ও জয়ন্তী 'বালক ঠাকুর' যে অন্য সব ছোট ছোট ছেলেদের চেয়ে আলাদা; তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) যে দেবতা, তিনি ইচ্ছা করলে যা খুশী তাই করতে পারেন, এটা বুঝে নিয়েছিল। তাই সহপাঠী হলেও, খেলার সাথী হলেও তারা বালক ঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতো। মাত্র ছ'বছর বয়সে শেফা পাঠশালার অন্যান্য সাথীদের নিয়ে বালক ঠাকুরের জন্মতিথি পালন করেছিল। শেফা ও জয়ন্তী দুজনেই বালক ঠাকুরের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে বলেছিল, ''তুমি আমাদের 'দধিবাহন, তুমি আমাদের গোপাল ঠাকুর। তুমি আমাদের ভাল কইরো। চিরদিন তোমার চরণে রাইখো। আমরা যেন চিরদিন তোমার চরণে থাকতে পারি।'' বালক ঠাকুর ঐ বাল্যবয়সে, মাত্র ছ'বছর বয়সে পাঠশালার সাথীদের এই ভক্তি ও নিষ্ঠায় এবং তাদের পূজায় এত খুশী হয়েছিলেন যে, তিনি কথা দিয়েছিলেন, ''চিরদিন তোমরা আমার কাছে থাকবে।'' এই কথা শুনে শেফার আবার কি কান্না। বালক ঠাকুর তাকে বলেন, 'তুমি কাঁদছো কেন?' শেফা বলে, ''আমি থাকতে পারবো তো? তুমি আমাকে কাছে

রাখবে তো।''

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হেসে বলেন, 'হ্যাঁ রাখবো।' তবে মেয়ের কান্না থামে। ক্রমে সবাই বড় হতে থাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর, বালক ঠাকুর পাঠশালা ছেড়ে স্কুলে ভর্ত্তি হলেন। শেফা ও জয়ন্তীও পড়াশুনা করতে লাগলো।

জমিদার বাড়ীর মেয়ে শেফা ছিল পরমা সুন্দরী, পড়াশুনাতেও মেধাবী। সেই শিশুবয়স থেকেই 'বালক ঠাকুর' যা বলতেন, সেটাই সে মান্য করে চলতো। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশে শেফা অক্সফোর্ডে যান এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে ডিগ্রী নিয়ে আসেন। তাঁর রূপ, গুণ, তাঁর বিদ্যাবত্তায় আকৃষ্ট হয়ে বহু শিক্ষিত ধনী যুবক তাঁকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি কারও ডাকেই সাড়া দেননি। বালক ঠাকুরের রূপে, গুণে, তাঁর আধ্যাত্মিকশক্তিতে, তাঁর অনন্ত তত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে, অভিভূত হয়ে শেফা শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণেই আত্মোৎসর্গ করেন। জয়ন্তীও পরম শ্রদ্ধাভরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন এবং তাঁর তত্ত্ব ও আদর্শে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁদের কাছে শ্রীশ্রীঠাকুরই ছিলেন একমাত্র দেবতা এবং তাঁর প্রতিটি কথাই বেদবাক্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ অমান্য করার কথা তারা চিন্তাও করতে পারতেন না। বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বলেন, ইহজীবনে তাদের সঙ্গে আর শ্রীশ্রীঠাকুরের দেখা হবে না। মৃত্যুর পরে তারা মিলিত হতে পারবেন পরমপিতার সাথে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা সদাসর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাড়া পাবেন। শেফা ও জয়ন্তী অশ্রুসজল নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করেন ও তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে ব্যাকুল নয়নে তাকিয়ে থাকেন শ্রীশ্রীঠাকুরের গমন পথের দিকে।



জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তারা নিষ্ঠা ভরে পালন করে চলেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ ও নির্দেশ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে তাঁদের যে গভীর জ্ঞান, গভীর তত্ত্বানুভূতি, অচল অটল নিষ্ঠা ও ভক্তি, তারই কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে শেফা ও জয়ন্তীর কথোপকথনে। পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুর কী গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে তাদের বিষয়ে আলোচনা করেছেন, শুনলে শ্রদ্ধায় আপনি মাথা নত হয়ে আসে।

তার সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী কোন এক ব্যক্তিকে শেফা বলছে পরমপিতা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে তার অন্তরের গভীর অনুভূতি, তার আবেগ, তার ভক্তি ও তার নিষ্ঠা, তার কথার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে কী সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। শেফা বলছে, **তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী) জানেন আমাদের কী হবে, কী করা উচিত। তিনি সেটা সবচেয়ে বেশী জানেন। শুধু তিনি জানেন বলেই আমরা তাঁর মনের সাথে এক মন হয়ে চিরযোগসূত্রে চিরদিন চিরযুগ একত্রে যে থাকতে পারবো, এই আশা পেয়েছি। এই আশার আলোর বার্তা আমরা জানতে পেরেছি।** সেই জানাটা শুধু আমাদের জানা নয়। তাঁর কাছ থেকে আরও বেশী যারা এরকম বিষয়বস্তু পেয়েছে, তারাও জেনেছে। তাঁর কার্যে, তাঁর কলাপে, তাঁর আচরণে, তাঁর ব্যবহারে, তাঁর শক্তিতে, তাঁর প্রেম ভালবাসায়, তাঁর সর্বদিক থেকে আমরা এমনভাবে বুঝে নিয়েছি যে, এই ব্যাপারে আমাদের মনে কোন দ্বন্দ্ব, সন্দেহের অবকাশ নেই। শুধু আমাদের বুঝের উপরেই আমরা দাম দিইনি। শত সহস্র জনের বুঝ এসে মিলিত হয়েছে আমাদের সাথে। তাঁর চিকিৎসা, তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের)

ব্যবস্থা, তাঁর বিধি, তাঁর নিয়ম, তাঁর কানুন সর্বদিক থেকে আমরা এমনভাবে বুঝে নিয়েছি, যেটা আপনাকে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছি না। কারণ ব্যক্ত করতে গেলে ছোট করা হবে তাঁকে। সুতরাং আমরা যেমন বুঝার বুঝে নিয়েছি। রসগোল্লা খেলাম, মুখে দিলাম, মিষ্টি। মিষ্টিটাকে আর বুঝানো যায় না। মিষ্টি কেমন? বুঝানো যায়?

মিষ্টি কেমন? অতি মিষ্টি, অদ্ভুত। এর বেশী আর বুঝানো যায়? মিষ্টির স্বাদটা কি, সেটা কি দেখানো যায় যে, এটার এই স্বাদ?

—না, এটা দেখানো যায় না।

এটা শুধু বলা যায়, এটা মিষ্টি। অদ্ভুত ভালো লেগেছে, এইটুকুই শুধু বলা যায়। আমার অভিব্যক্তিতে, আমার প্রকাশে এইটুকুনু আপনি বুঝতে পারবেন। আপনি বুঝে নেবেন যে, খুব ভাল লেগেছে। এইটুকু তো বুঝলেন? আমার সেই যে স্বাদ, যে স্বাদ আমি পেয়েছি, সেই স্বাদে কোন ভুল নাই। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, আমার সমস্ত মনপ্রাণ আত্মা অভিভূত হয়ে, মুগ্ধ হয়ে আছে। যার স্বাদ সোয়াদ বর্ণনায় বর্ণিত করা যাবে না। শুধু ঐ যে রসগোল্লা মিষ্টি, শুধু ভাল লেগেছে, অদ্ভুত ভাল লেগেছে। এই আমার ভাললাগার প্রকাশ ভঙ্গিমাতেই আপনি বুঝে নেবেন, তাঁর সাথে আমাদের যোগাযোগসূত্র কত বড় ও কত গভীর। কত যে গভীর সেটা ডুবেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডুবুরীও হার মেনে যাবে। তাঁর অতলের তল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সুতরাং আপনার কাছে এরচেয়ে বেশী কিছু আর প্রকাশ করতে চাই না।

—না না না। বুঝতে পেরেছি। আপনারা ভুলের পথে নয়। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনাদের বিবেক, বিচারের দিক দিয়েই



আপনারা অভিভূত হয়ে আছেন, মুগ্ধ হয়ে আছেন।

—তা নাহলে আমাদের বয়স বেশী নয়। রূপে গুণে প্রেম, ভালবাসায় মুগ্ধ হতে কি আমরা জানি না? কি মনে করেন? সব জানা আছে। এখানকার সমস্ত জানাগুলো জানি। মানুষ যা চায়, যা পেলে এখানে খুশী হয়, সেই গুণ আমার রয়েছে। **আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছি। আমি ইচ্ছা করলে কোন কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে ভাল একটা কিছু করতে পারি। কিন্তু লোভ, প্রলোভন কোনদিক থেকে আমার কোন সাড়া নেই। শুধু পেটের জন্য কিছু করা দরকার। সেই হিসেবে প্রয়োজনবোধে যা কিছু করার দরকার, ততটাই আমি করবো তাঁরই আদেশে। সুতরাং দেহ সুস্থ রেখে, মন সুস্থ রেখে যতটা করা দরকার করবো।** আমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াই। শিশুদের গড়তে আমার ভাল লাগে। আর যতটা পারি গভীরচিত্তে তাঁর আদর্শের কথা স্মরণে আনবো। যেন তাঁর চিন্তা নিয়ে সদাসর্বদা থাকতে পারি, এটাই আমার জীবনের মূল কথা।

চাতক পাখির দৃষ্টান্তই ধরা যাক। **চাতক পাখী বৃষ্টির জল ছাড়া পান করে না। সুতরাং চাতকের পান করার ব্যবস্থাও প্রকৃতিই করে রেখে দিয়েছে।** কি সুন্দর বোঝাচ্ছে।

—একদিনও কি আপনাদের মনে হতাশা নিরাশা আসে না?

চাতক পাখি বলতে পারে, 'মেঘ আয়। মেঘ আয়।' সে ডাকতে পারে। কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থা দেখুন, আকাশে বাতাসে জল তো জমা রয়েছে। তা থেকে যা ঝরে পড়ে, তাতে তার তৃষ্ণা নিবারণ হয়েও উথলিয়ে পড়ছে। সুতরাং এতটুকুনু মুহূর্ত্তও আমরা হতাশ হই না। নিরাশা মনে আসে না। আমাদের আনন্দের

জোয়ার, আনন্দের ধারা সবসময় বইতে থাকবে। কারণ পরম শান্তির পথ, পরম আনন্দের দিকটাই সবসময় এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের মৃত্যুভয় নাই, আমাদের কোন আতঙ্ক নাই। কোনরকম কোন ভয়ভীতি আমাদের নাই।

মাঝে মাঝে যে অসুখ বিসুখ হয়, তখন মনে করি, দেহ থাকলে অসুখ থাকবেই। ভুগতে হবে, ভুগছি। তাতে যদি মরতে হয় মরবো। এই শিক্ষা আমি পেয়েছি। অসুখ সারাবার ব্যবস্থার জন্য ওষুধ খেতে বলেছেন। ওষুধ খাই। চিকিৎসকের সাহায্য নিই। ওষুধ খাই। চিকিৎসা করি। তাতে যতটুকুনু হয় করি। ত্রুটি করি না। কোনরকম গাফিলতি করি না। খাওয়াতেও করি না। খেতেও করি না। খেতেও আমরা নিয়মকানুন করি না। ঠিকমত খেয়ে নিই। তারজন্য আমাদের উপোস করতে হবে বা এই খেতে হবে, সেই খেতে হবে, এরকম কোন বালাই নেই। যা ভাল লাগে, আমরা খেয়ে নিই এবং যাদের খাওয়ানো ভাল মনে করি, তাদেরে খাওয়াই। আমরা সবার সঙ্গে মিশি। সব কিছু করে আবার সবসময় একটু আলগা হয়ে আছি।

**কচুপাতার জল তো দেখেছেন? (ওরে বোঝাচ্ছে) কচুপাতার জল? জল কচুপাতাতে আছে। কিন্তু জল আর কচুপাতায় লাগে না। টলটল টলটল করছে। সব কচুপাতায়ই জল। জলটা মনে হয়, যেন একটা হীরার টুকরার মত লাগছে। কিন্তু যে কোন মুহূর্ত্তে জল কচুপাতা থেকে সরে পড়তে পারে।**

**আমরা সবাই এই পৃথিবীটাতে, এই দুনিয়াটাতে কচুপাতার মতন ভাসছি। কোনটার মধ্যেই আমরা যুক্তভাবে লেগে নেই। কিন্তু লেগে নেই বলে সরে যাওয়ার বুদ্ধিও আমাদের নেই।** সবটার মধ্যেই আমরা চলেছি। তাই আছি তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের)



কৃপায়। আমরা ভালই আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, শেফার কিছু কথা তোমাদের শোনালাম। শেফাকে দেখে একটি ছেলের পছন্দ হয়েছে। কথাবার্তা বলে খুশী হয়েছে। talented মেয়ে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করেছে। অপরূপ সুন্দরী। দেখে খুব ভাল লেগেছে। তখন ওকে (শেফাকে) জানিয়েছে। ওর মতামত চেয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মতামতের উত্তরে প্রশ্নোত্তরে যেসব কথা বলেছে, তার কিছুটা মাত্র বললাম। যেটুকুনু আমাকে জানিয়েছে, যেটুকুনু মনে আছে, সেইটুকুনু আমি বললাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শেফা আরও অনেক কথা বলেছে। শুনলে তোমরা আশ্চর্য হয়ে যাবে।

শেফা বলছে, তাঁকে (শ্রীশ্রীঠাকুরকে) কাছে থেকে পেলে কথা না হয় দুটো বেশী বলতাম। কিন্তু দূর থেকে আমরা তো তাঁর আলো উপভোগ করছি। চাঁদ কতদূরে। কিন্তু তার স্নিগ্ধ আলোতে মন ভরে যাচ্ছে।

তখন আবার জয়ন্তী বলছে, সত্যি। সূর্যের দিকে তাকানো যায় না, নারে?

—না। কিন্তু চন্দ্রের দিকে তাকাতে তো পারি। **একই ব্যক্তির দুইটি রূপ চন্দ্র আর সূর্য। চন্দ্র তো তাঁরই রূপ। সূর্য বলছে, "চাঁদের দিকে তাকাও। আমি কত স্নিগ্ধ। আমি কত সুন্দর। অন্ধকারে সে আলোটা কত মধুময় করে তোলে। কত জিজ্ঞাসার উত্তর পাওয়া যায়। কত মীমাংসার সুর খুঁজে পাওয়া যায়। অন্ধকারে এই আলো কত কী বলে দেয়।"** আবার তার পরক্ষণেই পূর্ব আকাশে যখন লাল হয়ে ওঠে, তখন সূর্য বলে, "দেখ, আমি কত বড়। এখনও তোমরা আমার দিকে তাকাতে

পার। তারপরে আর আমার দিকে তোমরা তাকাতে পারছো না। তারপরে তোমরা কি কর? সব ছাতি মুড়া দিয়ে চল। ছাতি মুড়া দিয়া আমাকে আড়াল করে চলছো, যাতে আমাকে দেখতে না হয়। তাতে কিন্তু আমি রাগ করি না। আমার ভালই লাগে। কারণ আমার দিকে তাকালে চোখ নষ্ট হয়ে যায় যে। আমি তোমাদের চোখ নষ্ট করবো না। **যে চোখ দিয়ে তুমি সবাইকে দেখবে, সবকিছু দেখবে, সেই চোখ দিয়ে তাকালে কিন্তু আমায় দেখতে পাবে না। আমায় দেখার জন্য আলাদা চোখ ব্যবহার করতে হবে।" সূর্য বলছে, "আমার জন্য আলাদা চোখ তোমাদের গ্রহণ করতে হবে। এই চোখ দিয়ে আমায় দেখবে না। তারজন্য আলাদা চক্ষু লাগবে। জ্ঞানচক্ষু লাগবে।"**

শেফা বলছে, ঠাকুর আমাদের বলতেন না জ্ঞানচক্ষুর কথা? মনে আছে তোর জয়ন্তী?

—হ্যাঁ, মনে আছে।

সেই জ্ঞানচক্ষু দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকা যায়, তাঁকে দেখা যায়, বুঝা যায়। সেই চক্ষু নষ্ট হয় না। আর রাতের অন্ধকারে চাঁদকে দেখবার জন্য দিয়েছেন এই চক্ষু। **চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে থাকলে এই চোখ খারাপ হয় না। চোখ ভালও নাকি হয়। সুতরাং এখন আমাদের এই চোখ হচ্ছে, অন্ধকার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকার চোখ। আর দিনের বেলা প্রখর সূর্যের দিকে এই চোখ দিয়ে তাকালে চলবে না। সূর্য বলছে, "এই চক্ষু হচ্ছে বিবাদের চক্ষু, বৈষম্যের চক্ষু, হিংস্রতার চক্ষু। এই চক্ষুতে বৈষম্য আছে, বিবাদ আছে, পঙ্কিলতা আছে। ক্লেদে ভরা, হিংস্রতায় ভরা এই চক্ষু দিয়ে আমাকে (সূর্যকে) দেখতে এসো না। আমার জন্য আলাদা চক্ষু**



**রয়েছে তোমাদের ভিতরে।** সেটা হচ্ছে আজ্ঞাচক্র যেটাকে বলে, সেটাই হচ্ছে জ্ঞানচক্ষু। এই জ্ঞানচক্ষু উন্মুক্ত কর, উন্মুলিত কর। আপনিই দেখতে পাবে, সেই স্নিগ্ধতায় ভরা যে আমি, সেই আমিকে (সূর্যকে)। এই চক্ষু নয়। **জ্ঞানচক্ষু দিয়ে যত আমার দিকে তাকাবে, ততবেশী আমার গভীরতার পরিচয় তুমি পাবে"।**

**তাই কাছে আর দূরে, তাতে কিছু হয় নারে। তবু আমরা বাইরের দিক থেকে একটু যে বিচার করি, তাতে তারতম্য একটু তো হয়ই।** কাছে থাকলে, কাছে পেলে তাঁর খাওয়াটা দেখলাম, পরিধানে কি আছে দেখলাম, প্রসাদ পেলাম; তিনি হাসছেন, কথা বলছেন, সেগুলো পেলাম। তাতো স্বাভাবিক। কাছে থাকলে, কাছে পেলে, কাছের গুণতো একটা আছেই। তবু দেখ, আমরা ভেবে ভেবে সেটা দেখি। সেই বাল্যবয়সে যেইভাবে তিনি চলতেন, যেইভাবে তিনি বলতেন, সেইগুলি চিন্তা করে করে, অনুভব করে করে আমরা সেটা পাই। আমাদের কি সেটা কম লাগে? মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে তাঁর মুখ, ভেসে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর, 'আয় না? স্লেটটা দে না? পেন্সিলটা দে না'? মনে পড়ে না?

—হ্যাঁ, মনে পড়ে, জয়ন্তী বলে।

—সেটা কত সুন্দর বলতো? শব্দগুলো কানে ভেসে আসে। কত সুন্দর লাগে, বল দেখিনি? আরেকদিন পেয়ারা যখন পাড়লেন, এক হাতে পেয়ারা নিচ্ছেন, আরেক হাতে আমার হাতে, তোর হাতে পেয়ারা দিচ্ছেন। কত সুন্দর। এই পেয়ারা নিয়েই আরেকদিন কি করেছিলেন, মনে নাই?

সেদিন পেয়ারা কিছুটা খেয়েছেন। খুব ভাল মিষ্টি ডাঁশা

পেয়ারা। ডাঁশা পেয়ারা, আমিও খেয়েছি। ভাল লাগছে। তিনি করলেন কি, তাঁর পেয়ারাটা আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি তাকিয়ে রইলাম। 'তুমি যে দিয়ে দিলে? তুমি খেলে না?'

তখন কি উত্তরটা দিয়েছিলেন বল দেখিনি? 'আমি অন্যের মুখ দিয়েও খাই।' মনে আছে কথাটা?

—হ্যাঁ বেশ মনে আছে।

দ্যাখতো, তিনি আমাদের মুখ দিয়ে খাচ্ছেন। নিজের মুখ দিয়ে যে স্বাদ গ্রহণ করবেন, সেই স্বাদটা তিনি বড় মনে করলেন না। **তিনি সবচেয়ে বড় মনে করলেন, আমরা যদি খাই, সেই স্বাদে তিনি তৃপ্তিলাভ করছেন। তাতেই তিনি তৃপ্ত। সুতরাং যাঁর দৃষ্টিভঙ্গিমা শিশুবয়স থেকেই এমন, তাঁর (শ্রীশ্রীঠাকুরের) সম্বন্ধে আর কোন বক্তব্য আছে?** আমরা মনে মনে খেলা করি এইভাবে।

আবার মনে পড়ে, শিশুবয়সে মাঠ দিয়ে যাচ্ছি। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে কত কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে। কিছুদূর গিয়ে আমরা উত্তরদিকে চলে যাচ্ছি। তিনি চললেন দক্ষিণে। দক্ষিণ দিকে যাওয়ার সময় যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়, হাত নাড়তেন। সেই হাত দুটিতে যখন সূর্যের আলো পড়তো, মনে হতো যেন জ্বলছে। কি যেন জ্বলছে, মনে হতো না রে? সেই জ্বলন্ত হাত ভেসে ওঠে না, মাঝে মাঝে?

— হ্যাঁ। মনে হতো, কি সুন্দর জ্বলছে হাতগুলো। যেকোন আলোর চেয়েও সেই আলোকে মনে হতো কয়েক হাজার গুণ বেশী। কি ভাল লাগতো। সেই তৃপ্তিটা আমরা খুঁজে বার করি মধুকরের মতন, না রে? আপনমনে বলে চলে শেফা। **মধুকর যেমন ফুলে ফুলে মধু আহরণ করে মৌচাক ভরে তোলে।**



**আমরা কিন্তু তাঁর সাথে এখন খেলাধুলা করতে না পেলেও, আমরা কিন্তু খেলাধুলা করছি। সেইসব স্মৃতিগুলো মনে করে করে, কুড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসছি সেই মধুগুলো। তাতে আমাদের ভিতরে কত সুন্দরভাবে গড়ে উঠছে মৌচাক।**

ঠাকুর একদিন বলেছিলেন না, **'তোমরা মধুময় হও।' তাইতো, মৌচাকই তো মধুময়। আমরা তো মৌচাক। তাঁর থেকেই তো সব সংগ্রহ করে মধুকরের মতো আমরা জমিয়ে রেখেছি। তাঁর চরণে যেন সেই মধু দিয়েই আমরা তাঁর পূজা করতে পারি।** ঠাকুরকে পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করায়, জানিস্ না? মধু দেয়, তারপরে গোময় দেয়, গোচোনা দেয়, ঘি দেয়, দুধ দেয়, এই পঞ্চগব্য দিয়ে স্নান করায়। আমরা তাঁর পদসেবা করবো। সেই পঞ্চভূতের দেহ, সেই ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূত থেকেই তো এই দেহ এসেছে। এই দেহের মাঝে আছে যে মন, সেই মধুময় মন দিয়ে আমরা তাঁর পূজা করবো। আমরা পূজা করবো কি? আমরা তো প্রতিদিনই তাঁর পূজা করছি। প্রতিদিনই তাঁর চরণ আমাদের হাতে এসে পড়ছে। **তাঁর স্মরণে, বরণে, চিন্তায়, ঘ্রাণে, জ্ঞানে কোনদিক দিয়েই তো আমরা বিচলিত নই, তাঁর থেকে ছাড়া নই। আমরা তো সর্বাবস্থায় তাঁর সাথে যোগাযোগসূত্রে গাঁথা রয়েছি। এক মিলনের সুরে পরমানন্দে রয়েছি।** আমাদের কোন দুঃখ নাই, ব্যথা নাই। কাছে নাই বলে আমরা কি কখনও এতটুকুনু ভাবি, বল দেখিনি?

শেফা ও জয়ন্তী দুজনেই একসাথে বলে ওঠে, একদিনও তো ভাবিনা তিনি কতদূরে আছেন। তাঁর সাথে কোন দেখা সাক্ষাৎ নাই। আমরা যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তাঁর ঝঙ্কার পাচ্ছি। তাঁর সাড়া পাচ্ছি। তাঁর সুরে ডুবে রয়েছি। এর চেয়ে বড়

তৃপ্তি আর কি আছে সাধনা বিনা? আমরা যেন এইভাবেই তাঁর ধ্যানে, জ্ঞানে, প্রেমে ডুবে থাকতে পারি।

তিনি বলতেন না, সেই ৭/৮ বছর বয়সে, তোমরা তো বেহালা শোন, আমি কিন্তু এই দেহবীণা বাজাই। তাইতো। তখন কিন্তু অতটা বুঝিনি। এখন যতই বড় হচ্ছি, ততই বুঝতে পারছি। **আমরা কিন্তু এই বীণাই বাজাচ্ছি। আমরা যেন প্রভুকে আমাদের সুরের বীণা বাজিয়ে শোনাতে পারি। তাঁর গান, তাঁর জয়গান গেয়ে পরম তৃপ্তি লাভ করতে পারি।** সুতরাং সদাসর্বদা মনে পড়ে, তাঁর সেই হাসি, তাঁর সেই তাকানো, তাঁর সেই গান, তাঁর সেই আদর্শ, তাঁর সেই তত্ত্ব। তিনি কি সুন্দর শিশুর মত কথা বলতেন। বড় হয়েও সেই শিশুর মতই কথা বলে গেছেন। তাঁর শিশুমাখা মন আমাদের ভরপুর করে রেখেছে। **এই দেহবীণাযন্ত্রে যেন তাঁরই গীত, তাঁরই গান গাইতে পারি। তাঁর চলনে, বলনে, স্মরণে, বরণে, তাঁর গভীর সুরে, যেন তাঁর প্রাণে তাঁর চরণে ডুবে থাকতে পারি।** কি বল্? এরচেয়ে বড় আর কিছু নেই। সুতরাং আমরা তো একা নইরে। তিনি সদাসর্বদা রয়েছেন আমাদের সাথে সাথে, মননের সুরে সুরে।

সীতা ছিলেন বনে একা। তিনি 'রাম', 'রাম' বলে কত কেঁদেছেন। আমরা কাঁদবো কেন রে? সীতাকে বনবাস দিয়েছিলেন রাম। রামের এই কাজটা আমি পছন্দ করি না (বলে উঠলো শেফা), রাম কেন এটা করলেন? এতবড় একজন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে? তাকে বনবাস কেন দিলেন? তাকে এইভাবে ছেড়ে দিলেন কেন? যাকগে তাদের কি ব্যাপার ছিল, আমাদের বলে লাভ নেই। কিন্তু দেখ, আমাদের বলে কয়ে, আমাদের মত নিয়ে তিনি গিয়েছেন। সীতাকে তো মত নিয়ে বনে ছাড়েননি। হঠাৎ



তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছেন। আমরা তো সীতা নই। আমরা তাঁর অন্তরে সন্তানের মতো বাঁধা রয়েছি। সাধা যন্ত্রের সাধাতে রয়েছি। তিনি আমাদের পরমপিতা। আমরা বনেও নেই। আমরা রয়েছি তাঁর মনে। সুতরাং যেখানে মনে রয়েছি, সেখানে তো ভাববার কিছু নেই। আমরা যেই মনে চিন্তা করছি, তাঁরই মন নিয়ে খেলা করছি। আমার মন, তাঁরই মন। মনে নাই সেই কথাটা? ঐ যে চিঠি লিখেছিলেন, ঐ যে লেখা লিখেছিলেন, 'তুমি আমার কথা বলে দাও। আমার লেখা লিখে দাও।' এক মন না হলে একথা কেউ বলতে পারে? তাঁর মনে আছি বলেই তো তাঁর মনের কথা লিখতে বলেছেন। আমাদের তো কোন দ্বিধা বোধ হয়নি। কি লিখবো, কি ভাববো, চিন্তা আসেনি। আমরা যা লিখেছি, তাঁর মনের কথা লিখে দিয়েছি। সুতরাং কোনকিছু আমাদের ভাববার নেই। ভাবনাওয়ালা আমাদের ভাবনা ভাবছেন। সেই ভাবেতে আমাদের ডুবিয়ে রেখেছেন। তাই তাঁর ইচ্ছাই আমাদের উপরে সফল হোক। তাঁর ইচ্ছাতেই আমরা যেন চলতে পারি। এই কামনা, এই বাসনা, এই চিন্তা, এই ধ্যান, এই জ্ঞানে আমরা সদা ডুবে রয়েছি।

হেনা, শেফা, জয়ন্তী— এই তিনজনে যদি কথা বলে, মনে করবে, সব আমার কথা। মনে করবে, যেন আমিই কথা বলতাছি। ওরা এত ধাতস্থ, এত গভীর চিন্তায় রত এবং এত ডুবুরী হয়ে রয়েছে যে, যেই কোন অবস্থায়, যেই কোনদিকে তারা balanced. তাদের সমতা থেকে এতটুকু চ্যুত তারা হচ্ছে না। **তোমরা অবাক হয়ে যাবে, তাদের কথা শুনলে। তাদের ভক্তি করতে ইচ্ছে করবে। মনে হয়, দেবরাজত্ব থেকে এসে তারা যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। মান নেই, অভিমান নেই, অহঙ্কার নেই।**

**তারা তোমাদের চরণে এসে পড়বে। তারা তোমাদের আলিঙ্গন করবে। কেন করবে জান? তারা বলবে, তোমরা তো তাঁর সান্নিধ্য লাভ করছো।** তাঁর চরণে সবসময় তোমরা প্রণাম জানাচ্ছ। বাস্তবের দিক থেকে তোমরা আমাদের প্রণম্য। যদিও আমরা দূর থেকে তাঁকে প্রণাম জানাচ্ছি। কিন্তু ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তোমরা সবসময় তাঁর সান্নিধ্য পাচ্ছ। তাঁর চরণামৃত পান করছো। তাঁর প্রসাদ পাচ্ছ। তাঁর অমৃত বাণী শুনতে পাচ্ছ। দিদি গো, তোমরা কত ভাগ্যবতী। সুতরাং তোমাদের চরণ যেন সদাসর্বদা আমাদের মধ্যে থাকে। তোমাদের থেকেই খুঁজে পাব তাঁর সাড়া। তোমরা যে তাঁর প্রিয়, তাঁর অন্তর, তাঁর ভালবাসার জন। সুতরাং এর চেয়ে ভাগ্যবান, ভাগ্যবতী আর কে আছে বল?

একদিক থেকে বাস্তবক্ষেত্রে আমরা তাঁর কাছ হতে কিছুটা দূরে আছি, এটা ঠিক। তবে সেদিক থেকে আমাদের মনে কোন দুঃখ নাই, ব্যথা নাই। আমরা আনন্দ পাচ্ছি এই ভেবে যে, তোমরা তাঁর কাছ থেকে এসেছ। তাঁর সংস্পর্শ থেকে তোমরা আসছো। তাই তোমাদের জড়িয়ে ধরে প্রাণভরা আনন্দ উপভোগ করছি। এইভাবে তারা তোমাদের গ্রহণ করবে। **ওরা জানে না হিংসা, ওরা জানে না মতানৈক্য। ওরা জানে না অন্য কিছু। ওরা জানে, তাঁর কাছ থেকে যারা আসছে, তারাই ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। কে কি গালি দিল ওরা দেখে না। কোন হিংসা, কোন রাগ, কোন অভিমান কারও কিছু দেখে না।** যে যেভাবে যা খুশী বলুক, সবই তাঁর আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করে। তোমাদের সাথে যদি তাদের কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়, তখন দেখবে, তোমাদের দেখে তারা বুক ভরে আনন্দ গ্রহণ করছে। তারা কত সাড়া পাচ্ছে। তোমাদের জড়িয়ে ধরবে। আমার ছোঁয়াচটা তোমাদের থেকে নিয়ে নিচ্ছে।



এ যেন চুম্বকের মতো। প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে খুঁজে পাবে আমার সুর ও সাড়া। ব্যতিক্রম এতটুকুনু কিছু ওদের থেকে পাবে না এবং ওদের স্পর্শ পেলে তোমাদের অদ্ভুত লাগবে। ওরাই বলবে, সবাই তৈরী হতে পারবে। তৈরী হওয়ার জন্য ভাগ্য বা অদৃষ্টের কোন প্রয়োজনীয়তা হয় না।

তোমাদের বলবে, ঠাকুর নয় বছর বয়সের সময় বলেছিলেন, 'জন্মটাই এই সার্থকতার জন্য।' আমার প্রতিটি কথা কিভাবে গ্রহণ করেছে। **জন্ম হল কেন? বিরাট সার্থকতা যদি না থাকে, উদ্দেশ্যের সফলতা যদি না থাকে, প্রকৃতি অযথা আমাদের সাজা দেবার জন্য জন্ম দেয়নি। প্রতিটি জন্মের সফলতা রয়েছে, সার্থকতা রয়েছে এবং আছে বলেই স্বয়ং স্রষ্টাই হোক, স্বয়ং প্রকৃতিই হোক, আমাদের জন্ম দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্যে।** এখানে অন্য কিছু ভাববার আমাদের প্রয়োজনীয়তা নাই। **আমরা ভাগ্যের উপরে, অদৃষ্টের উপরে ছাড়বো কেন? আমাদের জন্ম যখন হয়েছে, হবার জন্যই হয়েছে। আমাদের জন্ম যখন হয়েছে, তৈরী হবার জন্যই হয়েছে।** যখন দাঁত ছিল না, জন্মের সাথে সাথে স্তন পায়। দাঁত হল, স্তনপান শেষ হল, আসলো অন্য খাদ্য। তার জন্য কি তোমাদের পরিশ্রম করতে হয়েছে? প্রস্তুতি রয়েছে প্রতিটি বস্তুর। তারপর আসলো পরপর পরপর কী তোমাদের খাদ্য। দেহের যা কিছু দরকার, সবকিছু সাজানো রয়েছে। এতগুলো সাজানো যদি বেঠিক না হয়ে থাকে, তবে এটার বেলা কি বেঠিক হবে? এটার সম্বন্ধে ভাবতে হবে? **পনেরটা জিনিস তোমার চাহিদার দিক থেকে তৈরী আছে, ঠিক আছে। সে তুমি কষ্ট করে পাও, হাঁক দিয়ে পাও, লাফিয়ে পাও, ডাকাতি করে পাও, যেভাবেই পাও, সেটা কোন বড় কথা**

**না। পাওনার বস্তু তোমার আছে, সেটাই হল কথা। কিন্তু একটার বেলায় কেন থাকবে না? পনেরটা যদি থাকে, ষোল আনাটাও আছে।** সেদিক থেকে তোমরা প্রস্তুতি নাও। প্রস্তুতির জন্য তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। উদ্দেশ্য সফলের জন্যই তোমাদের জন্ম। ভাগ্য, অদৃষ্টের কথা টেনে নিজের জীবনকে হতাশায় নিরাশায় ফেলে দিয়ে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলো না। একথা তোমাদের বলবে। আর 'দিদি' বলে যখন ডাকবে না, যেন কত রসে ভরা। কি মধুময় ডাক। তোমাদের বলবে, তোমরা ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। সার্থক তোমাদের জন্ম। তাঁর সান্নিধ্যে রয়েছ। তোমাদের জন্মের সার্থকতার খোঁজ মিলবে। পেয়ে গেছ। পেয়েছ। ধরে নাও। তাঁকে ধর।

খেজুর গাছের কথা কবে বলেছিলাম। শেফা জয়ন্তীকে বলছে, ঠাকুর বলতেন না রে, 'খেজুর গাছে সব কাঁটা।' দেখতো, সেই কাঁটা পাড়িয়ে কেমন করে সেই রসওয়ালা তার থেকে রস বার করে। সেই রস কি সুস্বাদু রে।

আমাদেরও তো কাঁটাবন পেরিয়ে যেতে হবে। যত কণ্টকই আসুক, পিছপা দিলে চলবে না। সেইভাবে আমরা প্রস্তুতি নেব, তৈরী হয়ে যাব, যাতে কাঁটা না বিঁধতে পারে। খেজুরের রসের কি স্বাদ, দেখতে পাচ্ছিস্ না? সেই স্বাদ গ্রহণ করে, সেই স্বাদে মন ভরে থাকবে। সেখানে আবার ঘাবড়াবার কি আছে? ভয় পাবার কি আছে? সেইজন্যই তো আমাদের পিছনে বোর্ডে একদিন ঠাকুর লিখেছিলেন না, 'মৃত্যু যখন আছে ভাববার কি?' কথাটা আমার শ্লেটে লেখা আছে নারে? কেন লিখেছিলেন? সাক্ষী দিচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুতো সাক্ষী দিচ্ছে। তুমি যে ভাবছো, কেন ভাবছো? বৃথা ভেবে সময় নষ্ট করছো কেন? মৃত্যু তোমার



আছে। মৃত্যু তোমার কয়বার হবে? একবারই তো হবে। দ্বিতীয়বার আর মরবে না। সুতরাং ঘাবড়াবার তো কিছু নেই। কাঁটাবন আসুক, বাঘ আসুক, পাহাড় আসুক, পর্বত আসুক, সাগরের ঢেউয়ে নিয়ে যাক, দিয়ে যাক, যাক যাক, যেথায় খুশী যাক। পাওনার দিক থেকে আমি বঞ্চিত হবো না। তাই তো ঠাকুর লিখেছিলেন বোর্ডে। আমি তিন/চারটি কথা বোর্ডে লিখেছিলাম, সেটা মনে করে রেখে দিয়েছে।

**মৃত্যু যখন আছে ভাববার কি আছে?**

**মৃত্যু একবারই হবে।**

**তাই চলার পথের পথিক এগিয়ে চল।**

**পিছপা দিয়ে লাভ কি?**

ঠাকুরের তখন নয় বছর বয়স ছিল না? তারিখ দিয়েছেন, মাঘ মাস ১৮/১৯ তারিখ।

সুতরাং প্রকৃতি এতবড় সুন্দর দৃষ্টান্ত রেখে দিয়েছে আমাদের সম্মুখে, আমরা সেইদিকটা দেখবো। সেটা স্মরণে রেখে আমরা কাজ করবো। **মৃত্যু তো আছেই। ভয় করবো কাকে? আমরা ডুবে থাকবো, স্বচ্ছ পবিত্রতায় হাবুডুবু খাব। তাঁর থেকে আমরা সব খুঁজে পাব।** তিনি তো বলেছিলেন 'জন্মটা হওয়ার জন্য। না হওয়ার জন্য তো নয়।' আমরা সেইভাবে প্রস্তুতি নিয়ে চলবো।

আর এখানে এসে মান অভিমান। কে বুঝলো, না বুঝলো। 'ক্যান এইরকম বুঝলা? আমি বলছি, তুমি বুঝে নাও। আমি বেঠিক বলছি না, ঠিকই বলছি। তোমরা মেনে নাও। আমার কথাগুলো বুঝে নাও।' এই যে কথাগুলি আমাকে বলতে হয়, এইটাও তাদের কাছে সপ্তম আশ্চর্য। অনেক আশ্চর্যের মধ্যে

একটা বিরাট আশ্চর্য। তিনিকে (তাঁকে) দু'বার বলতে হবে? যাঁর সব এক, তিনি একবাক্যে যা বলবেন, সেটাই ধ্রুবসত্য। সেই এক বাক্যে আমাদের চলা উচিত।

**এখানে তার বিপরীত চলছে। আমাকে বলছে, "না ঠিক না। তুমি আমাদের ভালবাস না। আমাদের ফেলে চলে যাবে। তুমি আমাদের লুকাচ্ছ।" মান অভিমানের কত ঝড় বয়ে যাচ্ছে এখানে।** আর সেগুলো বসে বসে আমি সামাল দিচ্ছি। মান অভিমান করছে আর আমি সামাল দিচ্ছি।

আর হেনা, শেফা, জয়ন্তী, ওরা সেটা বর্জন করেছে। ওদের মধ্যে এগুলি কিচ্ছু নেই।

এক কথা। তুমি এটা করবে।—হ্যাঁ।

কেন এটা করতে গেলে? না করলেই ভাল হতো।

— আচ্ছা।

আমি একথা বলেছি। তুমি জান?—হ্যাঁ

আমি যা বললাম, তুমি বুঝতে পেরেছ?—হ্যাঁ।

আমার কথার উপরে কোন দ্বিধা মন নেই। কি শুনলো, কার থেকে কি শুনলো, সেটা এসে আবার আমাকে বলবে? না। আমি যেটা বলবো, সেটাই ধ্রুবসত্য।

আমাকে এটা বলতে হবে না, 'তুমি বুঝতে পারছো না? বুঝে নাও। আমি তো ফাঁকি দেই না। জানো তো? আমি ছলচাতুরী করি না। তুমি বুঝে নাও। আমার কথা বুঝতে চেষ্টা কর।' এত কথা। এত কথা বুঝাতে গেলে তারা অপরাধ মনে করবে। নাক ঘষবে তাহলে মাটিতে। তিনি এমন কথা বলবেন, 'তুমি বুঝে নাও? আমার কথা তোমার বোঝা উচিত। তুমি ভুল



বুঝ না।' একথা তিনি আমাদের বলবেন? এরচেয়ে পাপ আর কি আছে? এরচেয়ে বড় ত্রুটি আর কি আছে? জীবনেও আমার কথার ওপরে তারা কথা বলেনি। যেকথা বলেছি, সেকথা বেদবাক্য। তাই তারা ঠকেনি।

**বাস্তবক্ষেত্রে ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে punishment (সাজা) চলছে ওদের ওপরে। আমার সাথে দেখা নাই। সাক্ষাৎ নাই, পড়ে আছে। কোনরকম কোন সংস্পর্শে নাই। কতবড় সাজা। কিন্তু সেই সাজাটা আশীর্বাদস্বরূপ মাথায় নিয়ে চলছে।** আর এখানে আমি বাঁকুড়া যামু, তাতেই কত অবস্থা, কত কান্নাকাটি। সব কাঁদতে বসেছে, কথার কথা বলছি। সেখানে আমি রেখে গেলাম, না গেলাম, এর কোন প্রশ্নই নাই। তাঁর মত, তাঁর পথ, তাঁর আদেশ, তাঁর উপদেশ, সেটাই শিরোধার্য, সেটাই আশীর্বাদ। তাঁর উপরে কোন কথা বলা সাজে না।

**আমাদের চক্ষু সূর্যের দিকে তাকাতে পারে না। আমাদের চক্ষু দিয়ে সূর্যের দিকে না তাকিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে। কারণ সূর্যদেব সবসময় সৃষ্টি রক্ষা করছেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলা সেখানে কারও সাজে না। চক্ষু নীচের দিকে তাকিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে হবে। জ্ঞানচক্ষু ফুটলে তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারবে।** এর আগ পর্যন্ত সূর্যদেব বলছেন, 'আমার দিকে তাকিয়ে তোমাদের কথা বলা সাজে না। সাজবে না। বুঝতে পেরেছ?' সুতরাং এই চক্ষু দিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলা চলবে না। তিনি বলছেন, 'মাটির দিকে তাকাও। আমার আদেশ পালন কর।' এই হল সূর্যের উপদেশ। সুতরাং তিনি হচ্ছেন জ্ঞানসূর্য। তাঁর আদেশ, তাঁর উপদেশ শিরোধার্য করে আমরা চলবো। আমরা মাথা নত করে

তাঁর প্রতিটি আদেশ, উপদেশ পালন করে চলবো। তাঁর দিকে চোখ তাকিয়ে কথা বলা? এরচেয়ে বড় অপরাধ কিছু নেই। আমাদের যখন জ্ঞানচক্ষু ফুটবে, বিবেকের চক্ষু ফুটবে, তখন তাঁর দিকে হাতজোড় করে, করজোড়ে তাকিয়ে আমরা তাঁর রসাস্বাদ গ্রহণ করবো। তখন তিনি তাকাতে বলেছেন। চোখ না ফোঁটা পর্যন্ত আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে কথা বলবো না। কি বলিস্ জয়ন্তী?

—সত্যি তো।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজান্দ-হিন্দ-ফৌজ যখন ভারতবর্ষের কাছাকাছি এসে পড়লো, তখন বৃটিশরা ভারতীয় সৈন্যদের বুঝিয়ে দিল যে enemy ঢুকে পড়েছে, জার্মান সৈন্যরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছে। বাঙালী সৈন্যদের সরিয়ে গুর্খা ও গোরা সৈন্যদের আগে পাঠানো হল। এদিকে চোঙা ধরে I.N.A. Force চৈৎকার করছে, ''নেতাজী সুভাষ বোস কা দল আতা হ্যয়। আমরা আজাদহিন্দ ফৌজের লোক, আমরা ভারতবাসী। আমরা এসেছি। তোমরা আমাদের সাহায্য করো, সহযোগিতা করো, তোমরা এগিয়ে এস। ভুল করোনা। ভুল বুঝো না। আমাদের আক্রমণ করো না। আমাদের গুলি করো না। আমাদের মেরো না। মেরো না।'' এদিকে তাদের দেখেই ইংরেজ শাসক হুকুম দিয়েছে, 'start, গুলি কর।' গোরা সৈন্য আর গুর্খা ফৌজরা ৬০ হাজার সৈন্যকে মেরে ফেললো। I.N.A. force-এর একজন flag হাতে করে গড়াতে গড়াতে বাংলাদেশ সীমান্তে এসে flag পুঁতে দিয়ে মারা গেল। তখন সবাই বুঝতে পারলো, 'হায় হায়? কি ভুল করেছি।'

**আমার বেলায়ও ঠিক তাই। আমি মহাকাশের কথা জানিয়ে**



**চিৎকার করছি। সেই বর্ণনায় সবাইকে জানাচ্ছি। সবাইকে সেই সুর দিয়ে যাচ্ছি। সবার ভিতরে ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা করছি। চিৎকার করে যাচ্ছি। কিন্তু ভিতরের enemy গুলো, ভিতরের germ-গুলো ভুল বুঝাচ্ছে। তারা সবসময়ই বলছে, 'না যাবি না। মরবি। বিপদে পড়বি, ফ্যাসাদে পড়বি।' তাতে হল কি। আমার চিৎকারটাই রয়ে গেল। আমি চলে গেলাম। পড়ে রইলে তোমরা। সেটাই রয়ে গেল। বিচ্ছেদটাই রয়ে গেল। ভুল বুঝাবুঝিটাই বড় হয়ে গেল। এটা তো মৃত্যু সমতুল্য। যেখানে আমার আদেশ উপদেশের অমান্য করা হয়, আমার সাথে ভুলবুঝাবুঝি হয়, এরচেয়ে মৃত্যুতুল্য আর কি আছে বল?**

তারা কামানে বন্দুকে মরছে। তোমরা মনের বন্দুকে, বিবেকের দংশনে, বিবেকের কথা না শুনে, ভুল বুঝে ভুল করলে। এটাও তো একপ্রকার মৃত্যু হয়ে গেল। এটাকে বলে মৃত্যু সমতুল্য। এটাই চলছে। তাও তো আমি অনেক চাপিয়ে চাপিয়ে, চাপিয়ে চাপিয়ে রেখে রেখে, একটু একটু করে তালি দিয়ে দিয়ে রাখার চেষ্টা করি। তবুও তো গড়াতে পারছি না। গড়ে উঠতে পারছে না। সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিন তো চলে যাচ্ছে।

তাই মনের বাসনা যত শ্রীহরি পূরণ করে।
যার যত বাঞ্ছা মনে
ভক্তি কর সদাই মনে
হরিচরণে
মনের বাসনা যত শ্রীহরিপূরণ করে।

**ভিতরের বন্ধ দরজাগুলি খুলে যায় কিভাবে? তার নিয়ম হলো, তত্ত্বে দর্শনে স্পর্শনে শ্রবণে ভিতরের দরজাগুলো খুলে যায়।** আমাদের ভিতরে বহু দরজা আছে। যেমন মুর্শিদাবাদের

হাজার দুয়ারীতে হাজার দরজা আছে না? এরকম ভিতরে সহস্র সহস্র দরজা আছে। এই দরজাগুলি খোলে কি করে জান? শ্রবণে খোলে, দর্শনে খোলে, স্পর্শনে খোলে, আদেশ পালনে খোলে। সব দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়। সেই উন্মুক্ত দরজায় যখন মুক্ত আকাশের মুক্তধারা, মুক্ত আকাশের মুক্ত বায়ু প্রবাহিত হয় মুক্ত আদেশ নিয়ে, মুক্ত কথা নিয়ে, তখন সব দরজা দিয়ে বইতে থাকে মুক্তির সুর। তখন মন পবিত্র ধারায় বইতে থাকে। বিবেক তখন বলতে থাকে, এতদিনে পেলাম রে মনেরই খোরাক।

এতদিনে পেলাম রে আনন্দেরই সুর।

এতদিনে পেলাম রে চিদানন্দে ব্রহ্মানন্দে যাওয়ার পথ। আয়রে তোরা আয়। কে নিবিরে সেই সুর, সেই গীতগান। আয়রে তোরা আয়। সময় যে আর নাই। দরজাগুলো খুলে গেছে। এবার চলরে আপনমনে আপনসুরে। মননের গভীরে মগ্ন থেকে চলরে তোরা চল। এই দরজা বন্ধ থাকলে সবই যে গেল বন্ধ হয়ে। এরচেয়ে দুর্ভাগ্য কিছু নাই রে আর। তাই সব ভিতরের দরজা খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা কর। এই ব্যবস্থায় নাই রে কোন কঠিন ব্যবস্থা। অতি সহজ, অতি সরল। শুধু শ্রবণে, দর্শনে, স্পর্শনে, আদেশ নির্দেশ পালনে হল, এই দরজা খোলার ব্যবস্থা। এটাই একমাত্র সম্বল। এই ভাবেই শুধু দরজা খোলা সম্ভব। এছাড়া অন্য কোনকিছুতে দরজা খোলে না। শুধু আদেশ বহন কর, নির্দেশ বহন কর। শ্রবণে দর্শনে, তন্ময় থাক। আপনি স্ফূরণ হবে। আপনি সব দরজা খুলে যাবে। **সূর্যদেব তখন বলবেন, "আমি দুইহাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। তোরা কোলে আয়। জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। এবার তোরা আমার স্বরূপ খুঁজে পাবি। এবার ভয় নাই। এবার তোদের তাকাতে কোন লজ্জা নাই। এবার তোদের**



**তাকাতে কোন ভয়ভীতি নাই। এবার তাকালে তোদের চক্ষু নষ্ট হবে না।** খুলে গেছে দ্বার। দ্বারী এবার দাঁড় ধরে বসে আছে। এবার দ্বারী দাঁড় রক্ষা করছে। এবার দ্বারী তরী ভাসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছে। দ্বারী দাঁড় ধরে হাল ঠিক রেখে চলার পথের পথিকদের আহ্বান করছে, 'আয়রে তোরা আয়'। সে হাল ধরে চলার পথের দিকটায় সুন্দরভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চলরে এবার চল।"

মরিচা পরা লোহা আগুনে দিয়ে পিটিয়ে হাঁপড়ে ঝালিয়ে ইস্পাতে পরিণত করেছে। আবার চুম্বকের স্পর্শে লোহা চুম্বকত্ব লাভ করছে। তাই মরিচা পরা সবারই থাকে। এই মরিচাগুলি পরিষ্কার হয় কিসে? অন্য কিছুতে হয় না। শ্রবণে, দর্শনে, অনুভূতিতে এবং আদেশ পালনে হয়। আর কিসে হয়? **এখানে শতভাবে মন বিক্ষিপ্ত থাকবে, চঞ্চল থাকবে। শত কথা মনে আসবে। তাতে কোন ক্ষতি হবে না। তাতে কিছু আসে যায় না। ঐ যে শ্রবণ, ঐ যে দর্শন, ঐ যে অনুভূতির (অনুভব করাই অনুভূতি) রাজত্বে বিচরণ, তাতে স্বচ্ছতার দিকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। চলার পথের দিকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।** এটা আপনিই হয়ে যাবে। ভাত ডাল যেমন ভিতরে গেলে হজম হয়ে যায়, এটাও সেরকম। তারজন্য ভাগ্য-অদৃষ্টকে দোহাই দিলে চলবে না। "কি জানি, হবে কি না। বুঝলাম না তো। মন বিক্ষিপ্ত। মনে তো আবার কত কথা আসে।" আসে আসুক। আসতে দাও। বাতাসে তো কত ধুলা ওড়ে। সে ধুলা তো নাকেও যায়। সব কি মরে যায়, মিশে যায়? সেই ধুলা উড়বে। সেই ধুলা আবার মাটিতেও পড়বে। শতকথা মনে আসবে। শত চিন্তা মনে আসবে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে চলবে। আবার তারই স্পর্শে সব ধুলা, মাটির ধুলা আবার

মাটিতেই পড়ে যাবে। তোমাদের দ্বার খোলা দিয়ে কথা। দ্বার খোলার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। দ্বার খোলার জন্য আলাদা কোন পরিশ্রম করতে হবে না। আলাদা কোন সাধনা করতে হবে না। আলাদা বনে যেতে হবে না। আলাদা চোখ বুঁজেও বসে থাকতে হবে না। শুধু দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আদেশ নির্দেশ পালন, এতেই বলছে যথেষ্ট। তারজন্য অসাধারণতার দিকটায় কোন প্রস্তুতি নিতে হবে না। উলের জামা তো বুনোট (বোন) কর। উলের জামা বুনতে বুনতে যদি শোন, তাতেও যথেষ্ট হবে। অন্য কোন ব্যবস্থা, অন্য কোন কিছু করতে হবে না।

তাই **প্রকৃতি মহাকাশ থেকে এই নির্দেশ দিচ্ছেন, অতি সহজেই তোমাদের সব দুর্লভ বস্তুর সন্ধানে তোমরা যেতে পারবে। সুতরাং বাহক হয়ে অতি সহজেই সব উপলব্ধি করতে পারবে। সেদিক থেকে কোন অসুবিধা হবে না।** তোমরা যা ভাব, যা চিন্তা কর, যত কিছু আবিলতা, যত কিছু ঝঞ্ঝাট, এই বুঝি হলো না, এই দিকে হলো না, এই মন এদিকে নষ্ট হয়ে গেল। সময় চলে গেল, ইত্যাদি চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই। **মৃত্যুর ১ সেকেন্ড আগে থেকেও সবকিছু হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে প্রকৃতিতে। এই যে প্রকৃতির মহাদান, এই দান থেকে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।** প্রকৃতির দান তো সবাই গ্রহণ করতেই আছে। বেঁচে যতক্ষণ আছে, তাঁর দানেতেই সবাই বেঁচে আছে। তবু বলছে, দানের কৃতজ্ঞতার দিকটা যেন বজায় থাকে। প্রকৃতির এই মহা দানের কথা আমরা যেন কখনও বিস্মৃত না হই এবং প্রকৃতির এই মহা দানের সদ্ব্যবহারের দিকটায় আমরা সবাই যেন সচেষ্ট থাকি। আজ এই থাক।

*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*



*-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-*

## অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

| | *পুস্তক পরিচিতি* | *প্রকাশকাল* |
|---|---|---|
| ১) | বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন | শুভ মহালয়া, ১৪১১ |
| ২) | মৃত্যুর পর | শুভ মহালয়া, ১৪১১ |
| ৩) | পরপারের কান্ডারী | শুভ বড়দিন, ১৪১১ |
| ৪) | সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু | শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১ |
| ৫) | অঙ্গীকার | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২ |
| ৬) | ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি | শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২ |
| ৭) | বীজ ও মহাসৃষ্টি | শুভ মহালয়া, ১৪১২ |
| ৮) | শুভ উৎসব | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২ |
| ৯) | তত্ত্বসিন্ধু | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২ |
| ১০) | দেহী বিদেহী | শুভ নববর্ষ, ১৪১৩ |
| ১১) | পথপ্রদর্শক | শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩ |
| ১২) | অমৃতের স্বাদ | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩ |
| ১৩) | বৈদিক বিপ্লব | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩ |
| ১৪) | সুরের সাগরে | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪ |
| ১৫) | পথের পাথেয় | শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪ |
| ১৬) | জন্ম মৃত্যু রহস্য | শুভ মহালয়া, ১৪১৪ |
| ১৭) | মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪ |
| ১৮) | আলোর বার্তা | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪ |
| ১৯) | কেন এই সৃষ্টি | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫ |
| ২০) | জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ | শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫ |
| ২১) | তত্ত্বদর্শন | শুভ মহালয়া, ১৪১৫ |
| ২২) | মহামন্ত্র মহানাম | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫ |
| ২৩) | পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান | শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫ |
| ২৪) | চেতনা ও মহাচৈতন্য | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬ |
| ২৫) | মনই সৃষ্টির উৎস | শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬ |
| ২৬) | সাধু হও সাবধান | শুভ মহালয়া, ১৪১৬ |
| ২৭) | লং পাহাড়ের ডায়েরী | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৬ |
| ২৮) | বাস্তব ও অধ্যাত্মবাদ | শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯ |
| ২৯) | যত্র জীব তত্র শিব | শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৬ |
| ৩০) | ম্যাসেঞ্জার | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৭ |
| ৩১) | আলোর পথিক | শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৭ |
| ৩২) | নাদ ব্রহ্ম | শুভ রাখী পূর্ণিমা, ১৪১৭ |
| ৩৩) | বিপ্লব দীর্ঘজীবি হউক | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৭ |
| ৩৪) | চিন্তন | শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১০ |
| ৩৫) | মহা জাগরণ | শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৭ |
| ৩৬) | পাপ পুণ্য | শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৮ |
| ৩৭) | মুক্তির পথ | শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৮ |
| ৩৮) | ঘুম সমাধি সাধনার চাবিকাঠি | শুভ মহালয়া, ১৪১৮ |
| ৩৯) | পরমপিতা | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৮ |
| ৪০) | স্রষ্টার সৃষ্টি ভাবনা | শুভ ২৫শে ডিসেম্বর, ২০১১ |
| ৪১) | জ্ঞানচক্ষু | শুভ শিবরাত্রি, ১৪১৮ |
| | **'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-** | |
| ১) | পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩ |
| ২) | পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪ |
| ৩) | পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3) | শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫ |